182.Od.921.
39.
13th 1922

মাষ্টার মহাশয়ের

খোস-গল্প।

BENGAL LIBRARY
31 JAN 1922
WRITERS BUILDINGS
CALCUTTA.

প্রথম ভাগ।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

D
6

২২ নং রামতনু বসুর লেন,

কলিকাতা।

১৩২৮ সাল।

মূল্য ১।০ আনা।

182. Dd. 921. 39.

মাষ্টার মহাশয়ের

খোস-গল্প।

BENGAL LIBRARY
31 JAN 1922
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA.

প্রথম ভাগ।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

২২ নং রামতনু বসুর লেন,

কলিকাতা।

১৩২৮ সাল।

মূল্য ১৷০ আনা।

নিবেদন।

আজকাল বাজারে হিত উপদেশ ও ধর্ম্ম উপদেশের আদর অতি বিরল, শতকরা পাঁচজন লোক হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশের সম্মান রক্ষা করেন। আশা করি কিছুকাল পরে সে পাঁচজনও হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ ভুলিয়া যাইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে লেখক চক্ষুদান নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন, হিতোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাহা সুশোভিত। বর্ত্তমানে হিতের ও ধর্ম্মের বাজার মন্দা বলিয়া সে পুস্তকখানি সাধারণের আদরণীয় হয় নাই, তাহার কারণ বাজারে আজকাল কেবল প্রেমপূর্ণ কবিতা ও গল্পের দরকার, প্রেম বলিয়া যে খাঁটি প্রেম আছে, সে প্রেমের খরিদদার বাজারে খুবই কম, অর্থাৎ সে প্রেম বাজারে অচল। খাঁটি প্রেম যে ভগবান উপাসনা তাহা আজকাল প্রায়ই নাই। লোক দু'একবার ভগবানকে ডাকিয়া যদি সাড়া না পান, তবে আর তাঁহার খোঁজ খবর রাখেন না, ভগবানের সঙ্গে প্রেম করা খুবই শক্ত। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে প্রেম হয় তাহা স্বার্থপূর্ণ ও কৃত্রিম, অর্থাৎ কৃত্রিম প্রেম বিশুদ্ধ প্রণয় বলিয়া মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। লেখক তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবার কৃত্রিম প্রণয়ের বহুবিধ গল্প লিখিয়াছেন, এই খোস গল্প ১ম ভাগ পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ প্রেমের জেপলিনে চড়িয়া শূন্যমার্গে উড়িতে পারিবেন, নিজেত উড়িবেনই আরও স্বজন বন্ধুবান্ধবগণকে ঐ জেপলিনে চড়াইয়া তাহাদেরও উড়িতে শিখাইবেন। আশা করি এবার লেখকের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

প্রেমের রাস্তায় কি ভাবে দৌড়াইতে হয়, এবং কৃত্রিম প্রেমের পথে কি ভাবে হাঁটিতে হয়, প্রেমের উৎপত্তি কোথা হইতে, এবং নিবৃত্তি বা কোথা হইতে, প্রেম পাওয়া যায় কোথায়, এবং তাহার মূল্য কত, প্রেম শক্ত কি নরম, প্রেম সুস্বাদ কি বিস্বাদ, প্রেম চোকে না মুখে, প্রেম কথায় না কাজে, প্রেম তরী আরোহণে কত খরচ, প্রেমের তরণী তুফানে টেকে কিনা, প্রেমের তরণী কত লম্বা ও কত বিস্তৃত, প্রেমে কিরূপে হাবুডুবু খায়, প্রেম রাজ্যের রাজা কে, প্রেমের রাজকর পাওয়া যায় কিনা, প্রেম হইতে বিপদ হয়, না সম্পদ হয়, প্রেম সুলভ না দুর্লভ, প্রেমে সাঁতার দিলে কতকাল সাঁতার কাটা যায়, কতদিন একস্থানে বসিতে উঠিতে প্রেমের সঞ্চার হয়, এবং প্রেমের সঞ্চার হইলে কতদিন পরে আত্ম সম্মান বৃদ্ধি পায় বা আত্ম সম্মান নষ্ট হয়, প্রেম নদীর গভীরতা কত ইত্যাদি মাষ্টার মহাশয়ের খোস গল্প ১ম ভাগ নামক পুস্তক পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

খোস গল্পের ১ম ভাগ পুস্তকের অবস্থা বুঝিয়া ২য় ভাগখানি যাহা প্রস্তুত হইবে, প্রেমের সমুদ্র কিভাগে পার হওয়া যাইবে সে সমস্ত পরিষ্কাররূপে লিখিত হইবে, জাহাজ ভিন্ন দ্বিতীয় ভাগের সমুদ্র পার হওয়া কঠিন হইবে, ইহার কোন কোন স্থানে এত তুফান ডাকিবে, যে তখন জাহাজ ডুবুডুবু হইবে, জাহাজ ডুবুডুবু হইলে প্রেমের পরপারে যাওয়ার যে কি উপায় হইবে, তাহা এই খোসগল্পের ২য় ভাগ পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে যতই প্রেমের কীর্ত্তন থাকুক না কেন, প্রেম বিনামূল্যে কেহ খরিদ করিতে পারিবেন

না। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে যদি পান দোষ থাকে তবে কিছু দিনের মধ্যে সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া রৌদ্র, বর্ষা, শীত ও হেমন্তের শিশির ভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ তখনি প্রেম পাকিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিবে। সাধারণের নিকট আমার প্রার্থনা এই খোসগল্প নামক পুস্তকখানি প্রেমিকগণের নজরে পড়িলে লেখক চরিতার্থ হইবেন। নিবেদন ইতি

WRITERS' BUILDING
CALCUTTA

মাষ্টার মহাশয়ের
খোস-গল্প

১ম ভাগ।

বিনা তপস্যার ও একাগ্রতার ফল।

কোন এক গ্রামের নিকট এক বিল্বমূলে এক সন্ন্যাসী নারায়ণকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেন, বহুকাল ধরিয়া তিনি তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। তপস্যায় তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিও নাই, যদি একটা কুকুর কি একটা শেয়াল দৌড়িয়া গেল অমনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের নয়ন সেই দিকে গেল, সন্ন্যাসী অমনি বলিলেন নারায়ণ পাওয়া আমার কাজ নহে, একটু মনকে স্থির করিতে না পারিলে সেই ভূতভাবন ভগবানকে কি পাওয়া যায়? হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখিলেন, একটী ব্যাধ এক খানি ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং গাছের উপর একটী পাখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে সেই পক্ষীর প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিতেছে ও শর নিক্ষেপ করিয়া পক্ষীকে মারিতে উদ্যোগ করিতেছে। সন্ন্যাসীর সর্ব্বদাই চারিদিক

নজর, উনি দেখিলেন, যেরূপ ভাবে ব্যাধ পাখীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছে নিশ্চয়ই সে ঐ পাখীকে মারিবে। ব্যাধের বাহ্যজ্ঞান একেবারেই শূন্য, সন্ন্যাসী বুঝিলেন এইরূপ লক্ষ্য না করিতে পারিলে নারায়ণ পাওয়া অসাধ্য, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া ব্যাধের পরণের কাপড় খানি টান্ দিয়া খুলিয়া দিলেন, ব্যাধ পাখীর প্রতি এরূপ নজর রাখিয়াছে যে কাপড় খুলিয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই, যখন পাখীটা মারিয়া ভূতলে পাতিত করিল, তখন দেখে যে তাহার কাপড় খানি খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাধ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে আমার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে! ইহা আমি জানিতে পারি নাই। আমি কি এতই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম? ব্যাধ কাপড় খুব কসিয়া পরিতেছে এমন সময় সন্ন্যাসী মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাধ তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন? ব্যাধ বলিল দেবতা আমি একটি পাখী মারিবার আশায় এখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এখন ঐ পাখী মারিয়া ভূতলে ফেলেছি আমি এখান হইতে এখনই যাইতেছি যদি মহাশয়ের কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা কিছু মনে না করিয়া আমাকে মাপ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন, তুমি পাখীটি লইয়া একবার আমার কাছে এস তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। ব্যাধ পাখীটি লইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিল। সন্ন্যাসী [illegible]নে মনে ভাবিয়া দেখিলেন এই ব্যাধের মত মন প্রাণ ও লক্ষ্য [illegible] করিতে না পারিলে কখনই বিষ্ণুপদ পাইবার আশা করা না। সন্ন্যাসী বলিলেন ব্যাধ এই পাখীর দাম কত? [illegible] বলিল মহাশয় ইহার দাম আট আনা। সন্ন্যাসী বলিলেন

তোমার কে কে আছে ? ব্যাধ বলিল আমার এক পুত্র ও এক স্ত্রী মাত্র আছে, সন্ন্যাসী বলিলেন তুমি আমার যদি একটা উপকার কর তবে আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। ব্যাধ বলিল আমার শক্তি থাকিলে আমি নিশ্চয়ই আপনার উপকার করিব। সন্ন্যাসী বলিলেন তোমার সংসারে রোজ যত খরচ তাহা তুমি বল আমি তোমাকে দিব, আমার একটি ছেলে হারাইয়া গিয়াছে আমি দিন কতক খোঁজ করিয়া তাহাকে পাই নাই এখন এই বিল্বমূলে প্রায় বৎসর খানেক বসিয়া তাহাকে পাইবার জন্য ভগবানকে ডাকিতেছি কিন্তু আমার মনের জোর খুবই কম আমি ক্রমেই বুঝিতেছি যে ভগবান লাভে আমি বঞ্চিত হইব ও পুত্র মুখ বোধ হয় জন্মের মত আর দেখিতে পাইব না। তুমি একমাস চেষ্টা করিলে আমার পুত্রকে আনিয়া দিতে পারিবে, তোমার বাড়ীর খরচের জন্য যাহা দরকার তাহা বল আমি দিতেছি ব্যাধ বলিল মহাশয় আমার রোজ ১৲ একটাকা খরচ যদি নগদ টাকা দিতে পারেন তবে আমি আপনার ছেলেকে খুঁজিয়া আনিতে যাইব। সন্ন্যাসী বলিলেন ব্যাধ তুমি এই ৩০৲ ত্রিশ টাকা লও, তুমি এই টাকা বাড়ীতে তোমার স্ত্রীর কাছে দিয়া আহার করিয়া এই বিল্বমূলে আসিবে আমি তোমাকে ছেলের চেহারার বর্ণনা করিয়া দিব নচেৎ তুমি পাইবে কি প্রকারে ?

ব্যাধ পাখী লইয়া বাটীতে গিয়া স্ত্রীকে সন্ন্যাসীর পুত্র খুঁজিয়া আনিতে একমাসের জন্য যাইবে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, স্ত্রী বলিল ছেলের ও আমার খরচ কে দিবে ? তখন ব্যাধ সন্ন্যাসী দত্ত ৩০৲ ত্রিশ টাকা উহার স্ত্রীর হাতে দিল

স্ত্রী টাকা পাইয়া বলিল তুমি যাও, কিন্তু সাবধানে বন জঙ্গলে ঘুরিবে যেন কোন হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ নষ্ট না হয় ইহার দিকে নজর রাখিবে। সাবধানের বিনাশ নাই এই মহাবাক্য সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুত্রের খোঁজ করিবে। পুত্র পাইলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে দিয়া তুমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী আসিবে আর তোমাকে আমার বলার কিছুই নাই। তুমি আহার করিয়া এখনি রওনা হও। ব্যাধ স্ত্রী ও শিশু পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া ঠাকুরের কাছে হাজির হইয়া যোড়করে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গের প্রতিক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু ঠাকুরের ধ্যান প্রায়ই ভাঙ্গিয়াছে, ব্যাধের বেশীক্ষণ যুক্তকরে দাঁড়াইতে হইল না ; সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখিলেন এবং ব্যাধকে অমনি বলিলেন তুমি এসেছ আর দেরী করিও না এখনি রওনা হও, সমস্ত বন, জঙ্গল ঘুরিবার বেশী দরকার হইবে না, আমার ছেলেকে তুমি কদম্ব গাছেই দেখিতে পাইবে, সে কদম্ব গাছে থাকিতে খুবই ভালবাসে। ছেলের রূপ বর্ণন—তার হাতের তেলো লাল, পায়ের তেলো লাল, রং তার কালো, গলায় তার বনমালা, মাথায় তার ময়ূরের পাখা সে একটু বাঁকা কিন্তু অতিশয় দুষ্ট, ধরা বড় শক্ত, কিন্তু ব্যাধ, তোমার পাখী মারা লক্ষ্য হইতে সে পরিত্রাণ পাইবে না তুমিই তাহাকে নিশ্চয়ই ধরিতে পারিবে। পুত্রকে ধরিয়া আনিতে পারিলে তোমাকে আমি বেশী পুরস্কার দিব। ব্যাধ বলিল ঠাকুর আর একবার দয়া করিয়া আপনার পুত্রের রূপ বর্ণনা করুন আমি মনের সহিত শুনিয়া লই। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, তার হাতের তেলো লাল, পায়ের তেলো লাল, রং তার কালো, গলায় তার

বনমালা, মাথায় তার ময়ূরের পাখা, সে একটু বাঁকা, কিন্তু অতিশয় দুষ্ট ধরা বড় শক্ত প্রায়ই সে কদম্ব গাছে থাকে।

ব্যাধ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া. হাতের তেলো লাল, পায়ের তেলো লাল, রং তার কালো, গলায় তার বনমালা, মাথায় ময়ূরের পাখা, সে একটু বাঁকা, আর দুষ্ট, এই ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধ রওনা হইল, ব্যাধের চিন্তার মধ্যে দিবানিশি হাতের তেলো লাল, পায়ের তেলো লাল, রং তার কালো, গলায় তার বনমালা, মাথায় ময়ূরের পাখা, সে একটু বাঁকা আর খুব দুষ্ট। নিয়ত এই ভাবনায় ব্যাধ মাতোয়ারা হইয়া বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, নদীতে, হ্রদে ও সমুদ্র-তটে খুঁজিতে আরম্ভ করিল, ব্যাধের আহার করার কথা মনে নাই, গৃহলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা মনে নাই, হৃদয়ের রত্ন স্নেহের ধন পুত্রের কথা মনে নাই, কেবল মনে হাতের তেলো লাল, ইত্যাদি প্রায় ২৫।২৬ দিন অনাহারে জঙ্গলে বেড়াইতে বেড়াইতে ও ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে করিতে ব্যাধের শরীর কঙ্কাল সার হইয়া উঠিল, হঠাৎ একদিন ভক্তের ধন, বিষ্ণুপদ চিহ্ন বক্ষঃ নবীন নীরদ শ্যামবরণ, গোপিকারঞ্জন, ব্রজের ধন, বালক বেশী চপল স্বভাব, মোহন বাঁশী হাতে, মাথায় ময়ূরের পাখা, গলে বনমালা, বন, জঙ্গল কালোরূপে আলো করে কদম্ব তরুর শাখে বসিয়া গান করিতেছেন। ব্যাধ দেখিয়া বলিল ওরে দুষ্ট কু-সন্তান তোর পিতাকে কাঁদায়ে তুই এখানে গাছে চড়ে নৃত্য করিতেছিস্, তোর আহার জুটে কোথা হ'তে, তোর চেহারায় বোধ হয় তুই প্রচুর ও মূল্যবান সামগ্রী আহার করিস্, দুষ্ট, এখন আমার সঙ্গে তোর বাবার কাছে চল্, কালোবরণ হাসিতে লাগিলেন ব্যাধের কথা যেন

তাঁহার কানেই প্রবেশ করিতেছে না। যেমন গোপিনীদের বসন হরণ করে কার্ত্তিক মাসের শেষে কদম গাছে বসিয়া গান করিতে-ছিলেন এদিকে গোপিনী কামিনীরা বসন মাগিতে থাকায় উনি সে কথায় কান না দিয়া বাঁশরী মুখে দিয়া কিশোরীর নাম গান করিতে লাগিলেন ঠিক এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন. কিন্তু ব্যাধ সে তাহা শুনবে কেন॰ গোপিনীদের প্রাণ অপেক্ষা ব্যাধের প্রাণ শক্ত ছিল; ব্যাধ বলিল সয়তান, নরাধম পিতৃ-বঞ্চক! তুই কি আমার হাতে রক্ষা পাইবি এই ধনুর্ব্বাণে তোর প্রাণসংহার করিব। বালক তখন উচ্চহাস্ত করিতে লাগিল. ব্যাধ প্রায় এক মাস দারুণ শ্রমে ও অনাহারে কাতর, সহ্য করিতে না পারিয়া গাছে গিয়া উঠিল তখন বালক গাছের প্রত্যেক ডালে ডালে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ব্যাধ একেবারেই অবাক, যে ডালে ১০।৫টী ফল থাকিলে নুইয়ে পড়ে সে ডালের অগ্রভাগে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ সের ভারী বালকটী বেড়াইতেছে কিন্তু ডাল একটুও দমিতেছে না, ইহা দেখিয়া ব্যাধের মনে সন্দেহ হইল যে, এ বালক কথনই মানুষ নহে মানুষের এত সাহস আর এরূপ নবঘন উজ্জল শ্যামরূপ হইতে পারে না। আমার বোধ হয় বৃন্দাবনে যে কালোর কথা শুনেছি এ সেই কালো, আমি ভরসা করি ইহার শ্মরণ লইলে দয়া হইবে, তখন ব্যাধ নীচে নামিয়া মাটিতে জানু পাতিয়া উর্দ্ধকরে গলে বস্ত্র দিয়া শ্যাম সুন্দরের স্তব করিতে লাগিল তখন বালক স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিল ব্যাধ এই আমি আসছি আমি বাবার কাছে যাইব, তুমি না আসিলে আমি কথনই বাবার কাছে যাইতাম না। কিন্তু তুমি আমাকে কাঁধে করে নিলে আমি যাইব,

ব্যাধ স্বীকার করিল আমি কাঁধে করেই লইব তুমি নেবে এস, তখন-বক্র বালক নামিল, ব্যাধ উহাকে কাঁধে করিতে গিয়া দেখে যে অন্ততঃ বিশ মণ ভার বা তার চেয়েও বেশী, তখন ব্যাধ আরও হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! আমি পেয়েও হারাইলাম, হা ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল, এই বলাতেই ভগবানের কাছে কাতর স্বরে ভগবান বলিয়া ডাকিলে তিনি কি আর ভক্তকে কষ্ট দেন? অমনি বালক বলিলেন ব্যাধ আর বিলম্ব কর কেন চল গিয়া যমুনার ধারে জল পান করি বড় পিপাসা হইয়াছে ব্যাধ তখন কোলে তুলিতে গিয়া দেখলেন সামান্য একটা শোলার পুতুলের মত পাতলা এখন ব্যাধের চক্ষুঃদান হইল।

ব্যাধ বালককে লইয়া যমুনার ধার দিয়া ক্রমে ক্রমে চলিয়া তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল বুড়া সন্ন্যাসী চোক বুঝিয়া বসিয়া আছেন, ব্যাধ বলিল সন্ন্যাসী ঠাকুর এই আপনার পুত্রকে লইয়া আসিয়াছি এই দেখুন এই ত আপনার পুত্র; সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি উঠিলেন, তিনি ব্যাধ ও পুত্রকে কারুকে দেখিতে পান না, ব্যাধ বলিল ঠাকুর কই আর কথা কওনা কেন? সন্ন্যাসী বলিল, ব্যাধ আমি তোমাকে ও পুত্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না, ব্যাধ বলিল আপনি আমাকে বকসিস দিতে চাহিয়াছিলেন সেই জন্যই কারুকে দেখিতে পাইতেছেন না, আমি ব্যাধ আমি কপট সন্ন্যাসী চিনিতে পারি না! সন্ন্যাসী বলিল না ব্যাধ সত্য আমি দেখিতে পাইতেছি না তুমি আমাকে স্পর্শ কর, তুমি স্পর্শ না করিলে আমি দেখিতে পাইব না ঐ ধন তুই ভিন্ন আমায় কেউ দেখাইতে পারিত না।

তখন ব্যাধ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিল, তখনই সন্ন্যাসী কালো বরণ স্পষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন বাছা তোমাকে ব্যাধে পায় কিন্তু আমি পাই না কেন? বালক তখন বাবা বলিয়া সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে বসিলেন, একাগ্রতায় না হয় এমন কাজ নাই। আজকাল এইরূপ সন্ন্যাসী বিস্তর আছে কিন্তু ঐরূপ ব্যাধ বোধ হয় একজনও নাই ধন্য ব্যাধ। ব্যাধ পুরস্কার লইয়া নারায়ণের পদধূলি মস্তকে দিয়া পুত্র পত্নীর নিকটে গিয়া সকলকে কুশলে দেখিয়া আনন্দিত হইল।

এক্ষণে পাঠকপাঠিকাগণ ভাবিয়া দেখুন ব্যাধ বালকের রূপ বর্ণনা শুনিয়া মনের সহিত এত নিষ্ঠা ভাবে গ্রহণ করিয়া এক মাসের মধ্যে যে ধন লাভ করিয়াছে, সহস্র বৎসর সাধনা করিয়া মুনি ঋষিরা সে ধন লাভ করিতে পারেন না। দেখুন একাগ্রতার সমান কিছুই নাই।

ধর্ম্মরক্ষার পরিণাম।

দুইটী বালক, একটী জমিদার কুমার আর একটী রাজকুমার, দুইজন এক স্কুলে এক শ্রেণীতে পড়িত। প্রায় দেখা যায় বড় ঘরের ছেলেদের লেখা পড়া হয় না, তাহার কারণ তাহারা কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, লেখা পড়া অতি পরিশ্রমের সামগ্রী। জমিদার কুমারের নাম নরেশ, আর রাজকুমারের নাম নিরোদ। দুইজন যথাসময়ে স্কুলে যাইত বটে, কিন্তু পড়া শুনা শ্রীমাধব, দুইজন চুপ করিয়া ক্লাশে বসিয়া থাকিত, যদি মাষ্টার মহাশয়েরা চুপ করে বসে থাকা পছন্দ না করিতেন, তবে বাহিরে গিয়া উভয়ে গল্প ও পরিণামে কি হইবে তাই আলোচনা করিত। অধিক সময় একজন বলিত দেখ ভাই যদি আমার অবস্থা কোন সময় খারাপ হয় তুমি আমাকে দেখিও, আবার অন্যজন বলিত আমার অবস্থা খারাপ হইলে তুমিও দেখিও। এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে দেখিবে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করিল, বাস্তবিক সে প্রতিজ্ঞা অটল প্রতিজ্ঞা, আর বন্ধুত্বও খাঁটি বন্ধুত্ব। উভয়ের বয়স প্রায় একইরূপ, নরেশবাবুর বয়স ১৮ বৎসর আর নিরোদবাবুর বয়স ১৭-৮ সতের বৎসর আট মাস, দুইজন একবারেই স্বরূপের উপমা স্থল। উভয়েই সৌন্দর্য্যের গরিমা। উভয়কেই দেখিলে সহোদর বলিয়া বোধ হইত। ভাগ্যবান হইলে যেরূপ আকৃতি হওয়া দরকার তাহাদের কাছে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে দুই জন স্কুল ত্যাগ করিল এবং দুইজনই বৎসরের

মধ্যে বিবাহ করিল। বিবাহের পর বড়লোকদের প্রায় বন্ধু বান্ধবের কথা মনে থাকে না, ইহাদেরও এত বন্ধুত্ব হলে তাহাই ঘটিল।

কালের গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, রাজকুমার নিরোদের অবস্থা যেন কেমন খারাপ হইতে লাগিল, কেন খারাপ হইতে লাগিল তাহা নিজে বুঝিতে পারিল না, খারাপ হইতেছে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবস্থা অতি শোচনীয় হইতে লাগিল, যত অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল তত লজ্জা ও ভয় বাড়িতে লাগিল। স্কুলে পড়ার সময় যে যে প্রতিজ্ঞা যে যে জন্য হইয়াছিল তাহা সবই মনে পড়িতে লাগিল, কিন্তু মনে পড়িলে কি হইবে? এখন বিবাহ হইয়া দুইজনের সেই পূর্ব্ব কথা কত দৃঢ় ভাবে আছে তাহা ভাবিয়া বন্ধুকে পত্র লেখা বা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এরূপ ঘটিল না, লজ্জায় তাহা আটক করিয়া ফেলিল, তখন অন্য উপায় না দেখিয়া স্ত্রীকে বলিল দেখ সুখের অবস্থা ধ্বংস হইতেছে তাহা কি তুমি বুঝিতেছ? স্ত্রী তখনই চক্ষের জল ছাড়িয়া ক্ষিয়া বিষাদ স্বরে কাঁদিতে লাগিল আর বলিল যে আমার ভাগ্যে তোমার এরূপ দশা ঘটিতেছে, আমি হতভাগিনী যে দিন হইতে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছি সেই দণ্ড হইতে তোমার অবস্থা এত হীন হইতেছে। স্ত্রীর এই ক্রন্দন ও বিলাপপূর্ণ কথা শুনিয়া নিরোদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, নিরোদ বলিল আমি তোমার নিকট বলিয়া মনের কষ্ট লাঘব করিব তাই তোমাকে বাললাম, কিন্তু তোমার উত্তরে আমার হৃদপিণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে, তোমার ভাগ্যে বা আমার ভাগ্যে এইরূপ হইতেছে ইহা ভুল। সময় হইলেই এইরূপ

হইয়া থাকে, আমাদের সময় সত্বরই দুঃখময় হইয়া আসিয়াছে তুমি বড় ঘরের মেয়ে কষ্টের মুখ কখনও দেখ নাই, তাই আমার অভিপ্রায় তোমাকে তোমার বাপের বাড়ীতে কিছু দিনের জন্য পাঠাই। পুরুষের দশ দশা, সবই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তোমরা স্ত্রী জাতি অতি অসহ্য সহ্য করিতে পার না, এই জন্যই তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে থাকিলে আমি এই কষ্টের মধ্য হইতেও অনেক আনন্দ পাইব। আগামী কল্য ত্রয়োদশী, চল তোমায় ব্রাহ্মনগর তোমার পিতার ভবনে রাখিয়া আসিয়া আমি মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব। স্ত্রী উত্তর করিল যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবে আমি বাপের বাড়ী যাইতে রাজি হই, তোমাকে দারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলে কোনও ক্রমে বাপের বাড়ী যাইব না, তোমার কষ্ট ও আমার কষ্ট একই কষ্ট, তবু দুজনে একত্র থাকিলে, দুজন দুজনকে দেখে দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দ পাইব একাকী বৈকুণ্ঠে গেলেও সে আনন্দ পাইব না, মানব জীবন দুঃখময় এইরূপ বিপদ আপদ সহ্য করাই ধৈর্য্যশীলের কাজ, দুঃখ অন্ত হইলে আবার বিমল সুখ পাইব। তুমি দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিও না, ভগবানকে ডাক, হরিকে ডাকিতে ডাকিতে যদি বিপদ ঘটে তাহাকেও সম্পদ মনে করিও। এস দুজনে ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাকি। রাজকুমার দেখিল যে প্রাণপত্নীকে কোন রকমে মুগ্ধ করিতে পারিব না স্ত্রীলোক বুড়া হইলেও বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিলে আহ্লাদে আটখানা হয়, যাহা হৌক কোন ফিকির করে উহাকে দুই এক মাসের মধ্যে বাপের বাড়ী পাঠাইব। অবস্থা ক্রমেই

শোচনীয়, এ অবস্থা ফিরিবে সে আশা কদাচই করা যায় না. প্রায় দুই মাস হইল রাজকুমার দেনার জ্বালায় আর বাহিরে বাহির হইতে পারে না। হঠাৎ এক দিন স্ত্রীকে বলিল যে চল আমরা দুইজনেই তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়া কিছু দিন থাকিয়া যাত্রার পরিবর্ত্তন করি।

আহা! পতিপ্রাণা সরলা রাজবালা এ ছলনার কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্বামীর কথায় সম্মত হইয়া উভয়েই বাপের বাড়ীতে রওনা হইল, নীরোদ দুই দিন সেখানে থাকিয়া তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রে প্রাণপত্নীকে একাকীনী রাখিয়া দুঃখের আলয়ে অর্থাৎ নিজের বাড়ীতে আসিল। স্ত্রীকেও বন্ধুর কথা বলে নাই, বন্ধুর সঙ্গে নিজে দেখাও করিল না, দরজায় বড় একটা তালা দিয়া প্রাতেই তীর্থের সেরা হরিদ্বারে যাত্রা করিল। হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া পবিত্রা সলিলা গঙ্গামাকে দর্শন করিয়া রাস্তার দুইধারে ভিখারী ও ফকিরেরা বসিয়া ভিক্ষা করিয়া পবিত্র মনে ও মনের আনন্দে ভগবানের নাম গান করিয়া দিন কাটাইতেছে, ইহা দেখিয়া অতিথি ভিখারী দলের মধ্যে গিয়া বলিল ভাই সব আমিও তোমাদের চরণ প্রান্তে স্থান চাই, আমিও তোমাদের ভাই, তোমরা আমাকে ভাই বলিয়া তোমাদের নিকটে স্থান দিয়া আমার অন্তঃকরণকে পবিত্র কর। পাপের তাড়না হইতে আমাকে অব্যাহতি করাও। ভিখারী পুরুষেরা প্রশস্ত ললাট ও বিশাল বক্ষ ও উন্নত কলেবর দেখিয়া বিস্ময় হইয়া ইহার দিকে তাকাইয়া সকলে কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। রাজকুমার তখনি ভিখারীদের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া অবলীলা ক্রমে ভিক্ষা করিতে

ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরান করিতেছে। কর্ম্মফল ভোগ কত দিনে শেষ হইবে, তাহাই ভাবিতেছে। কিছু দিন বাদে উহার বাল্যবন্ধু জমিদার কুমার নরেশ তাহার স্ত্রীকে বলিল দেখ সংসারের আনন্দই পুত্র মুখ দর্শন, সে মুখ দর্শনে আমরা বঞ্চিত। এখন তীর্থ দর্শনও একটা পরমার্থিকের কাজ; সংসার চির কালই আছে, চল একবার সমস্ত তীর্থ কিছু দিনের জন্য ভ্রমণ করিয়া চিত্তকে আনন্দিত করি, দুয়েক দিন মধ্যে উহারা স্ত্রী পুরুষে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইল। উহারা উভয়ে গাড়ীতে চড়িয়া প্রথমে গয়াভূমে পিতৃ মাতৃ পিণ্ড দান করিয়া ক্রমেই চলিতে আরম্ভ করিল, বিন্ধ্যাচল, দণ্ডকারণ্য ও বাল্মীকি মুনির তপোবন, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও লব কুশের যুদ্ধস্থল সমস্ত একে একে দেখিয়া মনের আনন্দে এলাহাবাদ আগ্রা হাতরস ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া মথুরা, গোকুল পরে বৃন্দাবনে রাধারাণী দর্শন করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে হরিদ্বারে গিয়া একটা বাড়ী মাসখানেকের জন্য ভাড়া করিলেন। বাড়ী ভাড়া লইয়া পরদিন গঙ্গাস্নানে যাইবেন, রাস্তায় দুই পার্শ্বে অতিথি ও ফকিরদিগকে দিতে হইবে বলিয়া মুটের মাথায় প্রায় এক মণ চাউল ও এক কোঁচড় সিকি আধুলি টাকা ও পয়সা আর এক খানা সরা হাতে লইয়া স্ত্রী (জমিদার পত্নী) জমিদার কুমারের আদেশ অনুসারে অগ্রেই মুটের সঙ্গে বাহির হইল. বাহির হইয়া যেমন ভিখারী দেখিতে লাগিল অমনি সরা ভরিয়া ইচ্ছা মত চাউল ও অর্থাদি দিতে লাগিল তীর্থ স্থলে দানই তীর্থ ভ্রমণের ফল, বড় ঘরের মেয়ে ও অবস্থাপন্ন জমিদার পত্নী দানের ত্রুটী নাই দিতে, দিতে যেমন ভিখারী বেশী রাজকুমারের

নিকট উপস্থিত হইল অমনি তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, একি এমনও কি অদৃষ্টে হয়, ইনি যে দেবতা, দেবতা কি শাপ ভ্রষ্ট হইয়া হরিদ্বারে ভিখারী বেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বসিয়া আছেন ? জমিদার পত্নী তাহাকে ৫ সয়া চাউল ও দুইটী টাকা হাতে দিল, রাজকুমার যাহা পাইত তাহাই লইত, জমিদার পত্নী রাজকুমারকে দেখিয়া বুঝিল চির দিন কারো সমান যায় না, ক্রমে দুই ধারে ভিক্ষা ও অর্থ দিতে লাগিল আর পশ্চাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া ঐ মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে জমিদার পত্নী গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া স্বামীর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় স্বামীও মুটের মাথায় চাউল দিয়া কতকগুলি অর্থাদি কোঁচড়ে লইয়া ভিখারীদলের মধ্যে আসিল জমিদার পত্নী কেবল স্বামীর আগমন অপেক্ষা করিতেছে ও স্বামীর দিকে তাকাইয়া আছে। জমিদার বন্ধু চাউল ও অর্থ দান করিতে করিতে আসিয়া (রাজকুমার) ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বের সেই স্কুলে পড়ার সময়ের বন্ধুকে দেখিয়া একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল কে আমার প্রাণের বন্ধু ভিখারী বেশে হরিদ্বারে, ভিখারীর আসনে ভিখারীর ঝুলি কাঁধে তুমি কেন এখানে, ভাই বন্ধু বলিয়া তখনি দুই বন্ধু একত্রে উভয় উভয়কে জড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভিখারী ভাইরা ও তীর্থ যাত্রীরা সকলে একদম নির্ব্বাক ও জ্ঞান শূন্য, জমিদার পত্নীও গঙ্গার ধার হইতে বুঝিল যে আমার স্বামীর বিশেষ পরিচিত বান্ধব। জমিদার বন্ধু বলিল, বন্ধু সবই ভগবানের কার্য্য আর নিজের কর্ম্মফল ভোগ,

চল বন্ধু গঙ্গা স্নান করিয়া দুই বন্ধু একত্রে আহারাদি করিব। আমার স্ত্রী ঐ গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া আছে তোমাকে পেলে সেও অতি আনন্দিত হইবে আমরা এক মাসের জন্য এক খানি বাড়ী অনতিদূরে ভাড়া লইয়া গত কল্য রাত্রি হইতে সেই বাড়ীতেই আছি। চল স্নান করিয়া দুই বন্ধু মনের সুখে বাড়ীতে গিয়া সুখ দুঃখের কথা শুনিব ও বলিব। ভিখারী বেশী রাজকুমার বলিল বন্ধু তুমি বন্ধু পত্নীর সহিত স্নান করিয়া আইস, একত্রে তিন জনে তোমাদের ভাড়া বাড়ীতে যাইব আমি প্রাতেঃই গঙ্গাস্নান করিয়া থাকি আমি এখানেই থাকিলাম তুমি সত্বর এস। জমিদার বন্ধু স্ত্রীর নিকট গিয়া বাল্য কালের বন্ধুর সহিত বন্ধুত্বের কথা বলিল আর আর সমস্ত বাড়ীতে বসিয়া শুনিবে, দুইজন স্নান করিয়া বন্ধুকে সাথে লইয়া বাড়ীতে গেল।

জমিদার মহাশয়ের আদেশে জমিদার পত্নী স্বহস্তে পাক করিয়া দুই বন্ধুকে আহার করিতে দিল, দুই বন্ধু প্রফুল্ল মনে আহার করিয়া অন্যান্য সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিল, জমিদার বন্ধু বলিল, বন্ধু! যে অবস্থা তোমার ঘটিয়াছে ব্যক্তি-মাত্রেই ঐরূপ অবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়, আজ তোমার যেমন অবস্থা, কাল হয়ত আমারও ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে। আমি তোমাকে একটী নিবেদন করি, তুমি আমার সঙ্গে দেশে চল; আমি তোমাকে একটী বাড়ী দিব, আর মাসিক ৫০০৲ টাকা তোমার ও বন্ধুপত্নীর ভরণপোষণের জন্য দিব। তুমি কিছুই মনে করিও না, যদি আমার এই দশা হইত, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট হইতে ঐরূপ কিছু প্রার্থনা করিয়া লইতাম;

আমি তোমার বাল্য বন্ধু, বন্ধুত্ব সময়েই এইরূপ আমাদের প্রতিজ্ঞাও ছিল, দুঃসময়ের তাড়নায় তাহা হয়ত তোমায় স্মরণ নাই, কোন দোষ মনে না করিয়া তুমি প্রসন্নমনে আমার মতের উপর নির্ভর কর, আর আমি তোমার ধ্বংস রাজ্য উদ্ধারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিব। পত্নী ছাড়া হয়ে তুমি যেখানেই থাকনা কেন তাহাতে চিত্তের সুখ কাহারও নাই, বন্ধু পত্নী পিত্রালয়ে কত কষ্ট ভোগ করিতেছেন ; তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ? অতএব আমার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া আমাকে আনন্দিত কর। এই অবসরে বন্ধুপত্নীও বিশেষরূপে হাতে পায়ে ধরিয়া বন্ধুকে স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে বলিল তুমি আমাদের সঙ্গেই দেশে চল, তখন রাজকুমার বলিল আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব না, আমি কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই যাইব। ক্রমে ক্রমে এইরূপভাবে দিন কাটিতে লাগিল, যখন মাসখানেক প্রায় পূর্ণ হইল তখন জমিদার বন্ধু বন্ধুকে বাড়ী যাওয়ার জন্য বলিল। বন্ধু বলিল আমাকে খরচ পত্র দিয়া যাও আমি কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই যাইব। দু'এক দিন পরেই জমিদার বন্ধু পত্নীসহ বাটীতে রওনা হইবেন, বন্ধুর নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে যাওয়া হইবে তাহা বেশ বুঝিলেন, পরে বন্ধুর জন্য কাপড় ও পোষাক ইত্যাদি আর আর খরচের টাকা বন্ধুর হাতে দিয়া পতি পত্নী উভয়ে দেশে রওনা হইল। দেশে আসিয়া সংসারের উন্নতি চেষ্টায় রত হইল। ক্রমে ক্রমে এক মাস কাটিয়া গেল, হঠাৎ সেই দিন রবিবার বেলা ১২টার সময় দরওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল,

হুজুর আপনার হরিদ্বারের বন্ধু আসিয়াছেন, দরওয়ানের মুখে শুনিয়া জমিদার বন্ধু দৌড়ে নীচের তলায় গিয়া বন্ধুকে সঙ্গে করেই দ্বিতলে আসিল। দ্বিতলে দেওয়ালের সঙ্গে লাগালাগি এক খানি বেঞ্চ ছিল উভয়ে সেই বেঞ্চের উপর বসিল, জমিদার বন্ধু ত্রস্ত হইয়া পত্নীকে বলিল বন্ধু আসিয়াছে, তুমি বন্ধুকে নিজ হাতে পাক করিয়া খাওয়ার মত শীঘ্র ব্যবস্থা কর, আর যাহা সরকারী রান্না সেও হবে তবে বন্ধুকে তোমার নিজ হাতে পাক করে না খাওয়াইলে সুখী হইব না। জমিদার পত্নী বন্ধুকে নমস্কার করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতিপালনে গেল। একটু পরেই জমিদার বন্ধু বলিল বন্ধু চল স্নান করি; রাজকুমার বলিল বন্ধু আমি হাওড়ায় নামিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া জলযোগ করিয়া আসিয়াছি. এই কথা শুনিয়া বন্ধু বলিল তবে আর বিলম্বে দরকার নাই আমিও স্নান করি, ঐ বেঞ্চের উপর বসিয়া জমিদার বন্ধু তেল মাখিতে লাগিল। হাতের আড়াই হাজার টাকা দামের একটী অঙ্গুরী ও গলার দশ হাজার টাকা দামের এক ছড়া মালা তেলের বাটীর মধ্যে রাখিয়া নাইতে গেল। বন্ধু বসিয়া আছে, এমন সময় ইটের দেয়াল চটাং করিয়া ফাটিয়া একটী সাপ বাহির হইয়া ঐ অঙ্গুরী ও মালা ছড়াটী লইয়া প্রস্থান করিল। দেয়ালও পূর্ব্ববৎ যোড়া লাগিয়া গেল, দেয়াল যে কখন ফাটিয়াছে কিছুতেই তাহা বুঝা গেল না। বন্ধু এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল এবং চোর হইয়াছে ভাবিয়া ত্রস্তভাবে নামিয়া একেবারেই পলাতক। জমিদার বন্ধু স্নান করিয়া আসিয়া দেখে বন্ধু নাই, আর মালা, অঙ্গুরিও নাই। তখনি স্ত্রীকে ডাকিয়া

বলিল আর রাঁধিতে হইবে না বন্ধু চলিয়া গিয়াছে, তুমি আর কষ্ট করিও না, দাও আমাকে খেতে দাও। স্বামীর মুখ খানি অতি বিষণ্ণ দেখিয়া জমিদার পত্নী বলিল কি হইল বন্ধু কোথায় গেল কেন গেল, জমিদার বলিল আমার মালা ও অঙ্গুরী লইয়া পলাইয়াছে, হতভাগা চোর না হইলে কি হঠাৎ এমন দশা হয় যে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতে হয়? জমিদার পত্নী বলিল না ওরূপ বলিও না নিশ্চয়ই ইহাতে ভগবানের কিছু উদ্দেশ্য আছে, অসৎ লোক হলে কলিকাতায় অন্ন করিয়া খাইতে পারিত, সৎ বলিয়াই হরিদ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া পবিত্র ভাবে দিন যাপন করিতেছে, নিশ্চয়ই ইহাতে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য আছে, পত্নীর কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় আরও চটিল, দেখ তুমি স্ত্রীলোক হিতাহিত জ্ঞান তোমার খুবই কম তুমি চুপ কর আমি সবই বুঝেছি, জুয়াচোর বাটপাড়দের যাহা হয় তাহাই উহার হইয়াছে। যাক রক্ষা পাওয়া গেল। রাজকুমার হাওড়ায় আসিয়া গাড়ীতে চাপিয়া হরিদ্বারে আসিল, বন্ধুর বাড়ীতে সাপ কর্ত্তৃক যাহা ঘটিল সে কথা কাহাকেও না বলিয়া এখনও যে, পাপের শেষ হয় নাই এই অনুতাপে আত্মহত্যা করাই বিধি বিবেচনা করিল, যে বন্ধু আদর যত্ন করে বাটীতে অনুরোধ করিয়া লইয়া গেল, তাহার হার ও অঙ্গুরী নষ্ট হইয়া গেল, ইহা কি কম অনুতাপের কথা? কি পাপে এ শাস্তি ভোগ হইতেছে তাহা কে জানে? ভিখারী ভাইদের সঙ্গে রাজকুমার আর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না, সকালে এক মুঠো চাউল যাহা ভিক্ষা করিয়া মিলে তাহাই এক লোটা জলের সঙ্গে খাইয়া সমস্ত দিন নিকটস্থ

কোন এক বৃক্ষের তলায় শয়ন করিয়া চোক বুজিয়া কাঁদিতে থাকে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই, এখন স্থির করিয়াছে এইরূপ করিতে করিতে যত দিন বাঁচি, মৃত্যু সুখী ও সজ্জনের বন্ধু, আমার মত হতভাগ্যের কাছে কৃতান্ত আসিবে না, রাজকুমার নিয়ত একাকী বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসায় এই অবস্থায় অনেক দিন কাটিতে লাগিল। ওদিকে জমিদার পত্নী স্বামীকে বন্ধু দ্বারা যে হার অপহৃত হয় নাই ইহা পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে থাকায় বন্ধুরও মনের গতি একটু ফিরিল। বারো তের হাজার টাকা নষ্ট ইহা বড় লোকের পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ নয়। জমিদার কুমার পত্নীর একান্ত অনুরোধে বন্ধুকে আনিতে পুনরায় হরিদ্বারে গেল, সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে বন্ধু পূর্ব্বকার স্থানে নাই ভিখারী ভাইদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, প্রায় দেড় মাস এই ভদ্রলোক কিছুই আহার করে না আর ভিক্ষাও করে না নিয়ত শুইয়া শুইয়া রোদন করে, ঐ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া কাঁদিতেছে, বন্ধু তথায় গিয়া বন্ধু! ও বন্ধু! বলিয়া ডাকিতেই বন্ধু চমকিয়া উঠিল, কি বন্ধু, এখনও আমাকে বন্ধু বলিতে ইচ্ছা হয়? বন্ধু আমি তোমাকে লইতে এসেছি, সে দিন তুমি না বলিয়া না খাইয়া চলিয়া আসিয়াছ কেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজকুমার সাপের চটাং করিয়া দেয়াল ফাটিয়া অঙ্গুরী ও হার লইয়া যাওয়া বলিল. বন্ধু হাসিয়া কহিল আমি ওসব শুনিতে চাহি না তোমার বন্ধু-পত্নী বিশেষ অনুরোধ করে তোমাকে নিতে পাঠাইয়াছে তুমি আমার সঙ্গে চল এ অনুরোধ উপেক্ষা

করিও না, যদি তুমি না যাও তাহা হইলে সে বুঝিবে যেন আমার অযত্নে তুমি এসো নাই, অতএব বন্ধু তুমি চল। বন্ধু বলিল আমি গেলে হয়তো তোমার আরও ক্ষতি হইবে, বন্ধু বলিল যতই ক্ষতি হউক তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হইবে। দুই বন্ধু একত্রে রওনা হইল, এবং বাটীতে আসিয়া সেই দেয়ালের গায়ে লাগান সেই বেঞ্চখানিতে উভয়ে বসিল পাঁচ মিনিট পরে সেই দেয়াল চটাং করে শব্দ হইয়া ফাটিয়া গেল এবং এক সাপের মুখ হইতে অঙ্গুরী ও হার ঠক্ করিয়া বেঞ্চের উপর পড়িল জমিদার কুমার একেবারেই অবাক তখনি জমিদার-পত্নীকে ডাকিল, সকলেই দেখিল দেয়াল ফাটার কোন চিহ্ন নাই, সাপও নাই সকলেই স্তম্ভিত। বিধাতার খেলা বুঝে এমন সাধ্য কার? দুই বন্ধু স্নান আহার করিয়া বিকালে বন্ধু-পত্নী রাজকুমারীকে বরাহনগর হইতে আনিয়া, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীকে একটী বাড়ীতে স্থাপন করিয়া, জমিদারকুমার ও তাহার স্ত্রী উভয়েই বন্ধুকে জমিদার-পুত্রের সম্পত্তি সমস্ত উইলের দ্বারা অর্পণ করিয়া ষ্টেট হইতে মাসিক ২০০৲ টাকা নিজে পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া বন্ধুকে ঐ বাটীতে রাখিয়া নিজেরা স্ত্রী পুরুষে হরিদ্বারে যাত্রা করিল নির্জ্জন প্রদেশ ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না, বন্ধু বিপদে পড়িয়াছিল ও ভগবানকে নিয়ত ডাকিয়াছিল তাই তিনি সর্প রূপ ধারণ করিয়া বন্ধুর লোক লজ্জা নিবারণ করিলেন, ইহা দেখিয়া যে সংসারে বাস করে সে মানুষ মানুষ পদবাচ্য নহে। রাজকুমার বন্ধুর রাজ্য পাইল, দুএক মাসের মধ্যে নিজ রাজ্যও উদ্ধার করিল। সময় বিরুদ্ধ হইলে যদি যত্ন সহকারে ভগবানকে ডাকা যায় তবে আবার হয়ত সময় পাওয়াও যায়।

কলির কার্য্য।

এক নবাব ও তাহার উজির (মন্ত্রী) দুইজন প্রায়ই পাশাপাশি বাস করিত। নবাবের মাত্র নয় বৎসর বয়সের এক কন্যা ছিল। উজিরের ষোল বৎসরের এক পুত্র ও ১০ বৎসরের এক কন্যা ছিল। নবাবের কন্যার নাম দুনিয়াআনন্দ, মন্ত্রীর পুত্রের নাম জগৎবসন ও কন্যার নাম মলিনা, নবাবের কন্যার বিবাহ হয় নাই, মন্ত্রীর পুত্র কন্যা উভয়েরও বিবাহ হয় নাই। একদিন নবাব সাহেব উজিরকে ডাকিয়া তাঁহার সভার ভিতর বসাইয়া বহুসংখ্যক সভাস্থ লোকদের সামনে বলিলেন দেখ উজির তোমাকে আমি দুটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সাত দিনের মধ্যে এই দুই প্রশ্নের উত্তর এই সভাস্থ মহাত্মাগণের সম্মুখে সপ্তম দিন প্রাতে উত্তর দিবে. যদি উত্তর না দিতে পার তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে, আর তোমার সম্পত্তি, বাড়ী, ঘর, দরজা কাড়িয়া লইয়া তোমার পরিবারবর্গকে এখান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। উজির দেখিল আর রক্ষা নাই আমার উপর মনিবের কোপ পড়িয়াছে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে সহজ হইবে না। উজির স্বয়ং গলায় বস্ত্র দিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সভাজন সমক্ষে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন, হুজুর এই গোলামের উপর কি কি দুই প্রশ্ন আছে আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। নবাব বলিলেন ভগবানের রাজ্যে কিসের অভাব, আর তিনি করেন কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর আগামী রবিবারে সকালে সভ্যজন সমক্ষে তুমি দিবে, যেন তোমাকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ করিতে না হয়।

সাত দিন তোমাকে ছুটী দিলাম, তুমি ছয়দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করিয়া সপ্তম দিন সকালে প্রশ্নের উত্তর দিবে, আর কি বলিব। উজির নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিল, ভগবানের রাজ্যে কিসের অভাব, আর ভগবান করেন কি? ইহা সহজ বলিয়া বোধ হইল না, উজিরের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকেই ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল আর সপ্তম দিন প্রাতে নিজের প্রাণদণ্ড হইবে ইহাও বলিতে লাগিল পুত্র কন্যা ও স্ত্রী ইহারাও পথে বসিয়া ভিক্ষা করিবে তাহাও সকলকে বলিল, সকলেই উজিরের আতঙ্ক দেখিয়া ও ভবিষ্যৎ মৃত্যু জানিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইলেন। উজির পত্নী আহার পরিত্যাগ করিয়া দেব দেবী উপাসনা করিতে লাগিলেন।

উজির পুত্রও ভাবিয়া বাকুল হইল, রাজ্য হইতে দুর হইতে কাহারও মনে বেদনা নাই; কেবল পিতার মৃত্যু এই যাতনায় পুত্র কন্যা স্ত্রী সকলেই ম্রিয়মান; তখনকার নবাবদের হুকুম নড়িত না, স্তব স্তুতিতেও করুণা হইত না। সকলেই যত্ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই ফলবতী হইতেছে না, ক্রমে ক্রমে ৪দিন কাটিল, আর বাকী মাত্র দুই দিন, আজ বৃহস্পতিবার শুক্র, শনি. পরদিন রবিবার সকালে কি করিবে আর রক্ষা নাই। প্রবল লোক প্রায়ই তখন দুর্ব্বলের উপর এইরূপ অভাবনীয় কোপ করিতেন, দুর্ব্বলের সর্ব্বকাল একভাবেই কাটিতেছে, আর দেরী নাই উজির ক্রমেই আহার ত্যাগ করিল; উজির কেন, বাটীর সকলেই আহার ত্যাগ করিল। দিবা রাত্রি বাড়ীতে উচ্চ ক্রন্দনের ঢেউ উঠিল সকলেই সমান দুঃখী, কে কাহাকে চুপ করাইবে, তবে পাড়াগা দুই চারিটী বৃদ্ধ

বৃদ্ধা তাহারা দেখিতে আসিতেছে এবং দুঃখে অভিভূত হইতেছে, কিছু বলিবার যো নাই সকলেই ঐ নবাবের প্রজা। কলিকাতায় যেমন এবাড়ী ওবাড়ী কেহ কাহাকেও দেখেনা, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তাহা করে না উপকার হউক বা না হউক দেখা শুনা ও প্রবোধ বাক্যের অভাব হয় না। দেখিতে দেখিতে উজিরের মৃত্যুর দিন নিকট হইল ; আজ শনিবার, বাড়ীতে সকলেই আছে, কেবল সকাল হইতে উজির নাই, উজির বিকালে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জন্মের মত বিদায় লইয়া আসিতেছে পথের মধ্যে দেখে একটী ১৫।১৬ বৎসরের বালক ছোট এক খানি কাপড় পরিয়া পথের ধূলায় দুইটী হাঁসের ডিম হাতে করিয়া খেলা করিতেছে উজির যেমন পথ দিয়া আসিতে হয় তেমনি আসিতেছে ঐ বালক দেখিল উজির সাহেব আসিতেছেন কিন্তু পা এক জায়গায় দিতেছেন অন্য যায়গায় পা পড়িতেছে, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, মুখমণ্ডল দারুণ বিশ্রী, ললাট কুঞ্চিত চেহারায় মৃত্যু লক্ষণ, এই সব দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল উজির সাহেব আপনার ঈদৃশ আকার প্রকার দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে আপনার এই অবস্থার কারণ কি জানিতে পারি কি ?

উজির বলিল তুমি বালক, আমার বর্ত্তমান অবস্থা শুনিয়া তুমি কি করিবে ? আর শুনেই বা তোমার ফল কি ? বালক বলিল সামান্ত বালক বলিয়া আমায় ঘৃণা করিবেন না, সামান্ত হইতেও অনেক বড় কাজ হইতে পারে, সামান্য জনেও অনেক মহতের প্রাণ দান দিয়াছে, কাহাকেও সামান্য জ্ঞান করিতে নাই, আপনি দয়া প্রকাশে আপনার বর্ত্তমান কাহিনী আমাকে অবগত করান। উজিরের প্রাণে

শক্তি আসিল, উজির বালককে নবাব কর্ত্তৃক প্রশ্ন দুইটীর কথা বলিল, বালক বলিল ভগবানের রাজ্যে কিসের অভাব তাহ আমি জানি, আর ভগবান করেন কি, তাহাও আমি জানি। এই দুই প্রশ্নের উত্তর আমিই উত্তমরূপে দিতে পারিব, তবে নবাব সাহেব আমার নিকট হইতে উত্তর লইয়া আপনার প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা রহিত করিবেন কি না ইহাত জানি না ? এইরূপ প্রশ্ন করার কারণই আপনার সম্পত্তির উপর লালসা। আমি এই পথের মধ্যেই বসিয়া রহিলাম, আপনি সত্বর নবাবসাহেবের নিকট হইতে জানিয়া আসুন যে এই দুই প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষ হইতে কেহ দিলে তাহা মঞ্জুর হইবে কি না ? উজির তখনি নবাব সন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর আমার পক্ষ হইতে যদি কেহ উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেন তাহা আপনি মঞ্জুর করিবেন কি ? নবাব বলিলেন হাঁ তাহা আমি মঞ্জুর করিব। উজির শুনিয়া বালকের নিকট দৌড়িয়া আসিল, বালক বসিয়া আছে, বালককে উজির বলিল, হাঁ বালক তুমি উত্তর দিলে তাহা নবাব সাহেব আমার উত্তরের মত গণ্য করিবেন। উজির বালককে সঙ্গে লইয়া নিজের বাটীতে গেল, প্রাণদাতা বালককে দেখিয়া বাটীর সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল। বালকের সাজ সজ্জা অতি কদর্য্য উজির পত্নী উহা বদলাইবার চেষ্টা করিলেন, বালক বলিল আগামী কল্য প্রাতে প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিব, আমার এই বেশই উত্তম বেশ, মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হই। সকলের মনে কেমন একটা জোর আসিয়াছে সকলেই যেন বিপদ মুক্ত এই ভাবিয়া আনন্দিত।

পরদিন সকালে উজির নবাব সাহেবকে বলিল হুজুর সভার আয়োজন করুন; আমি উক্ত দুই প্রশ্নের উত্তর দিব। নবাব সাহেব সভার আয়োজন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সভা পরিপূর্ণ হইল, কতক লোক উজিরের প্রাণদণ্ড দেখিতে আসিল, কতকগুলি লোক এইরূপ শোকাবহ ঘটনা দেখিবার জন্য আসিল। যথাসময়ে উজিরের ডাক হইল, উজির হাজির বালক হাঁসের ডিম হাতে উজিরের পার্শ্বে দাঁড়াইল, সভাজনগণ সকলি সভা মধ্যে যাহার যেমন আসন সেইরূপ আসনে উপবেশন করিলেন। নবাব সাহেব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া উজিরের দিকে ও হাঁসের ডিম হাতে বালকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন কিছুক্ষণ পরে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন উজির তুমি উত্তর দাও, বালক বলিল হুজুর জিজ্ঞাস্য বিষয় বলুন আমি উত্তর দিতেছি। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক ! ভগবানের রাজ্যে কিসের অভাব ? বালক উত্তর করিল, হুজুর ভগবানের রাজ্যে কেবলমাত্র বিচারের অভাব। ইহা শুনিয়া সকল লোক একবাক্যে বলিলেন হাঁ সত্য বটে, ঠিকই উত্তর হইয়াছে, বালকের যথার্থ উত্তর হওয়াতে উজির কতকাংশে মুক্তিলাভ করিল। বালক পুনরায় বলিল, কেন যে বিচারের অভাব, কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব। বর্ত্তমান উত্তর আমার মঞ্জুর করিয়া লইতে আজ্ঞা হউক, নবাব সাহেব বলিলেন হাঁ তোমার উত্তর উপযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ভগবান করেন কি ? বালক বলিল হুজুর আপনি সিংহাসনে বসিয়া থাকিলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, হুজুরকে নীচে নামিতে হইবে। নবাব সাহেব

বালকের কথা মাত্রেই নীচে নামিয়া বালকের পাশে দাঁড়াইলেন বালক বলিল হুজুরের পরিধেয় পোষাক খুলিয়া দিতে হইবে, নবাব সাহেব তখনিই পোষাক রাজমুকুট ইত্যাদি একে একে খুলিয়া দাঁড়াইলেন, বালক ঐ নবাবের সমস্ত পোষাক পরিধান করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিল, সভামণ্ডপে এই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য লক্ষিত হইতে লাগিল, বালক সিংহাসনে উঠিয়া নবাব সাহেবকে আদেশ করিল আপনি আমার ত্যক্ত কাপড়খানি পরিধান করুন। নবাব সাহেব বালকের আদেশ মাত্রেই তাহার সেই ছোট, কদর্য্য মলিন কাপড়খানি পড়িয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইলেন, ইহাও এক অপূর্ব্ব ঘটনা। নবাব সাহেব কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান করেন কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দাও, বালক বলিল, তাহা কি এখনও হুজুর বুঝিতে পারিতেছেন না ? ভগবান, নবাবকে ভিখারী বালক করেন, আর ভিখারী বালককে নবাব করেন, এই ভগবানের কাজ, আর এইরূপ কাজই ভগবান করেন। ক্ষণেক পূর্ব্বে হুজুরই নবাব ছিলেন, আমি ভিখারী বালক ছিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখুন তাহার বিপরীত ঘটিল। সভাজন চাক্ষস দৃষ্টান্ত দেখিয়া বালককে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন, বালক বলিল হুজুর এ প্রশ্নের উত্তর যদি যথার্থ দেওয়া হইয়া থাকে তবে উজির সাহেবকে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন, তদ্দণ্ডে উজীরের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা স্থগিত হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে সভাভঙ্গ হইল। নবাব সাহেব বলিলেন বালক তুমি আমার বাড়ীতেই থাক আর এখানেই তোমার থাকার স্থান ব্যবস্থা হইল, তোমার মত কি ? তাহা

খোলসা করিয়া আমাকে বল, বালক বলিল হুজুর যাহা আদেশ করিতেছেন তাহাই আমার শিরধার্য্য আমি হুজুরের সন্নিধানেই থাকিব। নবাব বালককে বাটীতে লইয়া গিয়া ঠিক নবাবের যেমন চালচলন তেমনি ভাবে বালককে উপদেশ দিয়া বাড়ীতে রাখিলেন। কিছুদিন মধ্যে বালক নবাব সাহেবের মতানুযায়ী চালচলন শিখিয়া বাড়ীর সকলের অতি প্রিয় পাত্র হইল। নবাব সাহেবের আদেশে বালক লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল, অল্পদিন মধ্যেই বালক লেখাপড়ায় ও শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী হইতে লাগিল। নবাব সাহেব তাঁহার কন্যা ছুনিয়া আনন্দকে বালকের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকিবার জন্য গৃহিণীকে আদেশ করিলেন। গৃহিণীর নাম জহরমতি। জহরমতি বালকের নাম রাখিলেন অমলচাঁদ, বালকের পূর্ব্বের নাম কিছুতেই কাহাকেও বলে না, নুতন নাম অমলচাঁদ, অমলচাঁদই এখন নবাবের ভাবী জামাই ও সম্পত্তির অধিকারী। উজির কুমার জগৎবসন, অমলচাঁদের সহিত প্রায়ই খেলা ধূলা করে আর অনেক সময় বেড়াইয়া বেড়ায়। এইরূপ ভাবে উজির কুমার ও অমলচাঁদ প্রায়ই এক সঙ্গে থাকে দুই জনই দুই জনের বাড়ীতে যাতায়াতও করে। এইরূপ ঘটনার পর উজির বুঝিল যে সামান্য ডিমওয়ালাই নবাবের জামাই হইবে আমার জগৎবসনকে এখন দাদা বলিয়া ডাকিতেছে আর কিছু দিন পরে উহার হুকুমে আমার পুত্রের কাজ করিতে হইবে, আমার আশা ছিল যে নবাবের কন্যা পাত্রাভাবে জগৎবসনের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইবে, তাহা হইলে দাসত্ব হইতে জগৎবসন অব্যাহতি পাইবে, কিন্তু এখন দেখিলাম সামান্য হাসের ডিমওয়ালার হুকুমে

আমার জগৎবসনের উঠিতে ও বসিতে হইবে, ইহার চেয়ে আমার অধিক কি দুঃখ হইতে পারে? হা দারুণ বিধাতা, আমার সমস্ত আশা ভরসা ভিখারী বালক হইতে নষ্ট হইল! যাহাতে হতভাগার প্রাণ দণ্ড করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখন উহার সঙ্গে বিশেষরূপে মিশিতে চেষ্টা করিব। শত্রুর সঙ্গে অকপটে না মিশিলে প্রবল শত্রু নষ্ট করা যায় না। উজির সাহেব অমলচাঁদকে অতিশয় কপট ভালবাসিতে লাগিল। যেন অনুক্ষণ চোখে হারাইতে লাগিল। উজির নবাবের মন্ত্রী, উজিরের ক্ষমতাও প্রায় নবাবের তুল্য, মফঃস্বলে উজিরই নবাবের ন্যায় সম্মান পায়। উজির কতকগুলি দস্যুর সঙ্গে অতি সখ্যতা আরম্ভ করিল, সময় সময় ঐ সব দস্যু নবাবের রাজকার্য্য পরিচালন জন্যও দরকার হইত। উজির যখন বুঝিল জগৎবসন ও অমলচাঁদ উভয়ে তাহাকে সমান মান্য করে, তখন ভাবিল এইবার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

এক দিন উজির দস্যুদের ঠিক করিয়া রাখিয়া দিল বাটীর প্রায় একক্রোশ দূরে দস্যুদের একটী কুটীর স্থাপন করিয়া সেখানে আহারাদি দিয়া তাহাদের রাখিল। তাহারা সেখানে থাকিয়া মন্ত্রী যাহা আদেশ করেন তাহাই তাহারা প্রতিপালন করে। এ ঘটনা নবাব বাহাদুর জানেন না। হঠাৎ এক দিন উজির অমল চাদকে ডাকিয়া বলিল তুমি এই পত্র খানি লইয়া দক্ষিণ দিক বড় একটা অশ্বথ গাছ আছে তাহার কতকটা দক্ষিণে যে একখানা কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে এই পত্রখানি দিয়া আসিবে। পত্রখানিতে লেখা ছিল পত্রবাহক যাইবা মাত্রেই তোমরা ইহাকে বিখণ্ড করিয়া জলে ফেলিয়া দিবে। উজির পত্র

খানি বিশেষরূপে আঁটিয়া অমলচাঁদকে দিলেন, অমলচাঁদ পত্র লইয়া যেমন অশ্বথগাছ পর্য্যন্ত গিয়াছে অমনি সেখানে জগৎবসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। জগৎবসন জিজ্ঞাসা করিল ভাই তুমি কোথা যাইতেছ, অমলচাঁদ বলিল দাদা, উজির সাহেব আমাকে ঐ কুটীরে এই পত্রখানি দিতে আদেশ করিয়াছেন তাই আমি ঐ কুটীর পর্য্যন্ত যাইব। জগৎবসন বলিল ভাই, রোদের তাতে তোমার শরীর একেবারে ঘামিয়া গিয়াছে, তুমি অশ্বথ মূলে বসো, আমি পত্রখানি দিয়া আসিতেছি। আমি একে উভয়ে বাটী যাইব এই বলিয়া জগৎবসন পত্র লইয়া যেমন যাওয়া, দস্যুরা অমনি উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে করা। অমলচাঁদ অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দাদার আগমন না দেখিয়া নিজেই সেখানে গেল এবং দস্যুদের কাছে জিজ্ঞাসা করিল যে ছোকরা পত্র লইয়া আসিল সে কোথায়? দস্যুরা বলিল পত্রে যাহা লেখা আছে সেইমত কাজ করেছি, এই পত্র পড়ে দেখ, পত্র খানি হাতে লইয়া দেখিয়া বিষাদে পত্রখানি লইয়া বাটীতে আসিল দাদার কার্য্য একদম ফর্সা ইহাতে বেশ বুঝিল। মন্ত্রী ও মন্ত্রী-পত্নী উভয়ে জগৎবসন বাটী আসিতেছে না, ভাবিয়া তাহারা সদর মফঃস্বল করিতেছে এমন সময় অমলচাঁদকে দেখিয়া বলিল পত্র দিয়া আসিয়াছ, অমল উত্তর করিল দাদা পত্র দিতে গেল, আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়াছিলাম তাহার সন্ধান না পাইয়া আমি আসিলাম। উজিরের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল ক্রমেই কান্না অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল নবাব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন উজিরের বাটীতে কি হইয়াছে অমল বলিল উহার ছেলে কোথায় গিয়াছে। হজুর আমার

নিবেদন এই আগামী কল্য আর একটী সভা স্থাপন করিতে হইবে, আমি বলিয়াছিলাম ঈশ্বরের রাজ্যে বিচারের অভাব তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইব, সেই প্রত্যক্ষ দেখাইবার দিন আগামী কল্য প্রাতে। হুজুর আগামী কল্য সভার আয়োজন করিতে আজ্ঞা হয়। নবাব সাহেব বলিলেন আগামী কল্য সভা স্থাপন হইবে। পর দিন প্রাতে সভা স্থাপন হইল, উজিরকে আহ্বান করা হইল উজির ও পূর্ব্ব সভার সভ্যগণ সকলে সভায় হাজির হইয়াছে, দেখিয়া বালক বলিতে আরম্ভ করিল।

হুজুর দেখুন উজির সাহেব এই পত্র দিয়া আমাকে কোথায় পাঠাইয়াছিলেন, আমিত নিশ্চয়ই সেখানে যাইতেছিলাম পথিমধ্যে জগৎবসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে নিজে অশ্বথতলায় আমাকে বসাইয়া পত্র লইয়া গেল সেখানে দস্যুরা তাহাকে হত্যা করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছে; পত্রবাহক আমি আমাকেই তাহারা দ্বিখণ্ড করিয়া জলে ফেলিবে তাহা না হইয়া বিপরীত হইয়াছে এই দেখুন উজির সাহেবের হাতের লেখা চিঠি। এখন বুঝুন ভগবানের রাজ্যে সম্পূর্ণ বিচারের অভাব কিনা? সভাসীন সভ্যগণ ও নবাব সাহেব উজিরকে প্রশ্ন করিলেন এই কি ধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছ; উজির বলিল, আমি হিংসাপরতন্ত্রী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছি আমি আশা করিয়াছিলাম যে আমার কন্যার সঙ্গে অমলচাঁদের বিবাহ দিব, আমার পুত্র আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভাবী নবাব হইবে ইহার যখন একটীও আমার ভাগ্যে ঘটিল না, তখন ঐ হিংসা আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইল তাই আমি ঐরূপ করিয়াছি তখন নবাব উজিরের প্রাণ দণ্ড হইবার আদেশ প্রদান করিবেন

এমন সময় অমলচাঁদ বলিল না হুজুর তাহা না করিয়া আপনার কন্যা ও উহার কন্যা উভয় কন্যাই আমি বিবাহ করিব। বালক এবারেও উজিরের প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা রহিত করিলেন। আজ কাল ঐরূপ উজির এ জগতে বিস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু অমলচাঁদ ঐ একজন ছাড়া আর জন্মে নাই।

স্ত্রীলোকই অবিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও তিনটী পুত্র এবং তিন পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নগদ বিশ হাজার টাকা ছিল, কিন্তু এই বিশ হাজার টাকার বিষয় পুত্র ও পুত্রবধূরা কিছুই জানিত না, মাত্র উহার সহধর্ম্মিণী জানিতেন। ব্রাহ্মণের নাম তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য, স্ত্রীর নাম আদরমণি, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নাগেশ্বর, মধ্যম পুত্রের নাম সরল কুমার, ছোট পুত্রের নাম বিজয়চাঁদ। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম সরলা, মধ্যমা পুত্রবধূর নাম ইন্দুবালা, ছোট পুত্রবধূর নাম শরৎকামিনী. সংসারটী নিতান্ত ছোট খাটো নয়, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র দুইটী নিতান্ত ভদ্র, ছোট পুত্রটী অত্যন্ত চতুর, যুবক, দাম্ভিক, আর পরদুঃখে কাতর, সহিষ্ণু এবং ন্যায়পরায়ণ। বধূদের মধ্যে বড় ও মধ্যম এই বধূ দুইটীকে খাটিতে ও সময় মত কাজ করিতে হয় এবং স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা ভক্তি করিতে হয়, আর গৃহস্থ ঘরে সাধারণ ভাবে থাকিতে হয় এই তাহাদের ধারণা এবং ইহাই করিয়া তাহারা সংসারে সুখী। ছোট বধূ যুবতী, তেজস্বিনী, অভিমানিনী ও স্বামীসোহাগিনী, বয়স ১৬।১৭ বৎসর, বিজয়চাঁদের বয়স ২২ বৎসর। বিজয়চাঁদ খুব মুক্ত হস্ত, টাকা পয়সা হাতে পাইলেই অকাতরে খরচ করে, এবং ন্যায্য ব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। ব্রাহ্মণের বয়স অন্ততঃ ৭০ বৎসরের কম হইবে না, ব্রাহ্মণীর বয়সও ৬০ বৎসর প্রায় পার হইবার মত। বাটীর মধ্যে আদরমণি অতিশয় পক্ষপাতিনী ছিলেন। বউমাদের উপর সর্ব্বক্ষণই কোপপূর্ণা থাকিতেন। পুত্রগণকে গ্রাহ্য করিতেন না, স্বামীকে তৃণ জ্ঞান

করিতেন, অর্থ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বউমাদের সেবা শুশ্রুষায় তিনি একটুও সন্তোষ হইতেন না। ব্রাহ্মণের পুত্নী লইয়া চির দিনই অশান্তি, ঘরের দোষ সেকালের লোকেরা প্রকাশ করিতেন না; ব্রাহ্মণের ৭০ বৎসর বয়স হইলেও তাঁহার আজকালকার মত অম্বলের ব্যারামে শরীর শীর্ণ নয়, তিনি অতিশয় শক্তিশালী ও মোটা সোটা ছিলেন, বিশ হাজার নগদ টাকার মালিক, কিন্তু ব্রাহ্মণী টাকা কখনও নিজ হাতে পাইতেন না, তার জন্য তাঁহার মনে একটা কষ্ট ছিল, কষ্ট করিয়া ফল নাই, ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে খুবই শক্ত তিনি স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতেন না।

স্ত্রীলোক অগাধ অর্থ পাইলে কথায় কথায় অন্যায় করিতে পারে। স্ত্রীজাতি নিজে অন্যায় কাজ করিয়া পরের প্রতি দোষারোপ করে, ব্রাহ্মণ যদিও ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিতেন না, কিন্তু অর্থের বেলায় দারুণ শক্ত থাকিতেন। এক দিন ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রদের ও বধূদের এবং সহধর্ম্মিণী আদরমণিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা সকলেই উপস্থিত আছ, দেখ কোন গতিকে আমাদের খাওয়া পরা চলিতেছে, সংসারে উন্নতি কিছুমাত্র নাই, অনেকে অর্থাভাবে সংসারের উন্নতি করিতে পারে না, আমি পাড়াগেঁয়ে লোক আমার বর্ত্তমান ২০০০০ বিশ হাজার টাকা নগদ আছে, পাড়াগেঁয়ে লোকের নগদ বিশ হাজার টাকা থাকা সহজ নয়। পুত্রগণ! আমি আশা করিতেছি এই টাকা লইয়া তোমরা কোন একটী কারবার করিয়া তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নত হইতে চেষ্টা কর, আমি দুই চোখ বুজিলে নগদ টাকা তোমরা

বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে। নগদ অর্থ আর যুবা বয়স এই দুইটীই মানুষকে পাগল করে, আর বিবাদ ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করায়। পুত্রেরা তাহাতে সম্মত হইল, কিন্তু ছোট পুত্র বিজয়চাঁদ বলিল যদি আমি আপনার সঞ্চিত অর্থের কিছু পাইবার অধিকারী হই, তবে অংশ মত আমাকে তাহা দেন আমি দাদাদের সঙ্গে একত্রে কারবার করিব না। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম তাহারা বলিল আমরা দুই ভাই একত্রে কারবার করিব, যদি অভিপ্রায় হয় তবে আমাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা হয় তাহা দেন আমরা কারবারে লিপ্ত হই। তুলসীদাস ভটাচার্য্য বুঝিলেন এই, টাকা প্রত্যেকের হাতেই অংশ মত দিব যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক তবে তিন পুত্রকে পাঁচ হাজার করিয়া পনের হাজার দেই, আর নিজের আসন্নকালের ব্যবস্থার জন্য পাঁচ হাজার রাখি। পর দিন প্রাতে তিন পুত্রকে ডাকিয়া প্রত্যেকের হাতে পাঁচ হাজার করিয়া টাকা দিলেন, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুইজন একত্রে দশ হাজার টাকা রাখিল, কনিষ্ঠ নিজের কাছে টাকা রাখিয়া দুপুরে আহারাদি করিয়া বাটী হইতে টাকা লইয়া যাত্রা করিল।

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে দেখিল অনেক অন্ধ আতুর রাস্তার ধারে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মুখ ও অবস্থা দেখিয়া বিজয়চাঁদের অত্যন্ত দয়া হওয়ায় দুই হাজার টাকা তাহাদের দান করিয়া চলিয়া গেল। কতক দূর গিয়া দেখে এক বৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, বিজয়চাঁদ তথায় গিয়া বসিল, এবং সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে এমন কিছু কি আছে যাহাতে অগাধ অর্থ পাওয়া যায়? সন্ন্যাসী বলিলেন

অগাধ অর্থ তুমি কোন কাজে লাগাইবে, পরিষ্কার মন খুলিয়া তাহাই আমাকে বল, বিজয় বলিল আমি অন্ধ আতুরদের ভরণ পোষণ ও তাহাদের আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া দিব, ইহা ছাড়া কোন অযথা ব্যয় করিব না। সন্ন্যাসী বলিল আমার নিকট তিনটী কথা শিখিলে অগাধ অর্থ তাহার দ্বারা পাইবে, কিন্তু সে তিনটী কথা শিখিতে তিন হাজার টাকা চাই, তুমি দিতে সক্ষম হইবে কি? বিজয় তখনি তিন হাজার টাকা দিল, সন্ন্যাসী তিন কথা বিজয়কে বলিলেন, একলা পথে যেও না, সতর্কের বিনাশ নাই, আর স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিও না। এই তিনটী কথা শুনিয়া বিজয় ইহার ফল কি হইবে তাহা এখনও বুঝিল না, পরে কোথায় যায়, কি করে? তিন হাজার টাকা সোজা ব্যাপার নয়, মূহুর্ত্তের মধ্যে সন্ন্যাসীকে দিল, এখন আর খরচ নাই বাটী গেলে বাপই বা কি বলিবেন, দাদারা শুনিলেই বা কি বলিবেন এমন কোন উপায় নাই যদ্দ্বারা স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাইতে পারে? খুবই চিন্তিত হইয়া বাটীতে গেল, বাটীতে গিয়া দেখে দাদারা একটী বড় দোকান খুলিয়াছেন, কিন্তু সে দোকান বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী বাজারে। বাটীতে গেলে বুড়া বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজয়! তুমি কি কিছু করিতেছ? বিজয় বলিল বাবা আমি কিছু করিতেছি না, টাকা কি করিলে? বিজয় বলিল পথে যেতে অন্ধ দুঃখীদের দুই হাজার টাকা দান করিয়াছি, আর এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনটী কথা শিখিয়াছি, তাঁহাকে কথা শিখিতে তিন হাজার টাকা দিয়াছি, এখন শূন্য হাতে আমি বাটী আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতলেন আরও বলিলেন তোমার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে, ৭ দিন তোমাকে সময় দিলাম, তুমি আর আমার সম্মুখে কখনও আসিও না। তুমি নরাধম তোমাকে দেখিলে অযাত্রা অর্থ পাইলে যথেষ্ট ব্যয় করা ইহা হতভাগায় পারে, তফাৎ আমার বাটী হইতে! বিজয় বাটী হইতে বাহির হইল, তাহার বাটী হইতে বাহির হওয়া মাত্র তাহার স্ত্রী শরৎকামিনী প্রাণের সহিত দুঃখিত হইল, অবলা বিশেষ শ্বশুরের উপায়ের ভাত খায় তাহার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। বিজয় বাহির হইয়া পথে চলিবার সময় এক ধানের জমির ভিতর দেখে একটী বড় কাঁকড়া ধানের গাছে জড়াইয়া আছে, তখন উহার মনে হইল একলা পথে যেও না সন্ন্যাসী বলিয়া দিয়াছেন, ঐ কাঁকড়া ধরিয়া ধান গাছ দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিজয়চাঁদ লইয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই, মাত্র পথ পাইলেই হাটিতেছে কতক দূর গিয়া বিশেষ পিপাসা ও ক্ষুধা দুইই হইয়াছে, পথে রাস্তায় কোনও দোকান নাই দোকান থাকিলেও পয়সা নাই যাহাকে নিরুপায় বলে বিজয় তাই, সম্মুখে দেখে একটা বাগানের মধ্যে এক সুন্দর ঘাট বাঁধান পুকুর, পুকুরের চারি ধারে অনেক কলা গাছ, লিচু গাছ, পেয়ারা গাছ, জাম, জামরুল, আম ও কাঁটাল প্রভৃতির গাছ, অনেক গাছে কলা ও লিচু পাকিয়া রহিয়াছে, পাড়াগাঁয়ের পুকুর কোন পাহারাওয়ালা নাই বিজয় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুকুরপাড়ে বসিল এবং কতকগুলি পাকা কলা ও লিচু আনিল, কাঁকড়া বাঁধা ঘাটের ধারে ধান গাছে

বাঁধা আছে ; কলা লিচু রাখিয়া বিজয় নাইতে জলে নামিল। আশে পাশে চাষা ভাইরা কাজ করিতেছিল, উহারা সব আসিয়া বলিল ওগো বাবু তুমি জান না প্রকাণ্ড এক সাপ এই বাগানে আছে তাহার অত্যাচারে পুকুরে কেহ নায় না, বাগানে কেউ যায় না এখনি তোমাকে সাপে দংশন করিবে, তুমি বিষের দাহে মরিবে আমাদের কথা শুনিয়া তুমি সত্বর চলিয়া যাও নইলে রক্ষা নাই। বিজয় বলিল ভাই সব আমি ঐরূপ একটা সাপ চাহিতেছি আমার যে অবস্থা তাহাতে সর্পদংশনই আমার চির শান্তি, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি এমন জল ছাড়িয়া যাইব না।

বিজয় জলে নামিয়া মনের সুখে স্নান করিতেছে, পৈতা মাজিতেছে, পদ্ম ফুলের চাক তুলিতেছে, মৃণাল দণ্ড তুলিতেছে ও সাঁতার দিতেছে এদিকে বাঁধা ঘাটে সেই প্রকাণ্ড সাপ আসিয়া কাঁকড়ার পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছে ; সাপে কাঁকড়ায় জড়াজড়ি করিয়া সাপ কাঁকড়ার কামড়ে আটক হইয়া কুণ্ডল পাকাইয়া জড়ের মত স্থির হইয়া আছে। বিজয় ডাঙ্গায় উঠিয় প্রকাণ্ড সাপকে দেখিয়া একখানি লাঠি লইয়া সাপকে মারিতে মারিতে তাহার মাথা ছিড়িয়া ফেলিয়া, কলা, লিচু উদর পুরিয়া খাইয়া, যখন উঠিয়া যায় তখন চাষা ভাইরা দেখে যে বিজয় চলিয়া যাইতেছে, তাহারা বলিল বাবু সাপ কি দেখেন নাই ? বাবু বলিল সামান্য একটা কেঁচোর মত সাপ দৌড়ে এসেছিল তাহাকে মারিয়া তাহার মাথা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি, তোমরা দেখে এস, এখন তোমাদের জল খাবার ঘাট পরিস্কার হইয়াছে। তাহারা সাপ দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইল, এবং তাহার দেহ, মাথা সব ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এরূপ আশ্চর্য্য বাবুত কখনই দেখি নাই। বাবু! এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে যে রাজকুমার যায় এক রাত্রিতে সেই রাজবাটীতে রাজকুমারীর এক বিছানায় শুইয়া পর দিন সকালে তাহার মরা শরীর মাত্র বিছানায় থাকে, মৃত্যুর কারণ কেহ বুঝিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস যদি আপনি একবার সেখানে যান, তবে ঐ রাজকুমারীকে বাঁচিয়া থাকিয়া বিবাহ করিতে পারিলে যথেষ্ট অর্থসম্বলিত রাজত্ব ও রাজকুমারীকে পাইবেন, আপনার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ আপনি তাহা বুঝিয়া শুঝিয়া চেষ্টা করিয়া একবার দেখিবেন। বিজয় সেই গ্রামে গিয়া বেলা ১টার সময় উপস্থিত হইয়া দেখে যে রাজবাটীতে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া যে ব্যক্তি এক রাত্রি জীবিত থাকিবে সেই রাজার সমস্ত রাজ্য, নগদ অর্থ ও রাজকুমারীকে পাইবে। বিজয়চাঁদ বলিল মহারাজ আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, রাজামহাশয় তখনি তাহাকে বাটীতে থাকিতে স্থান দিলেন, আর বলিলেন যে, রাত্রে আহার করিয়া আমার কন্যার নিকট রাত্রি যাপন করিতে হইবে, যদি নিরাপদে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে আপনার জীবন থাকে তবে আমি রাজকুমারী ও নগদ অর্থ আর রাজ্য সম্প্রদান করিব। আর জীবন না থাকে, বা আপনার মরণের ভয় হয় তবে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না; অনেক রাজকুমার এইরূপ লোভে পড়িয়া রাত্রের মধ্যে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, আপনার সাহস হয়তো আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় করুন।

বিজয়চাঁদ বলিল আমার দৃঢ় সাহস আছে। রাজামহাশয় বলিলেন তবে আপনার আহারাদির যোগাড় আমার বাড়ীতে হোক। বিজয় বলিল আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আপনার সংসারের কিছুমাত্র ভক্ষণ করিব না। আমাকে টাকা দিন আমি বাজার হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া নিজ হাতে পাক করিয়া খাইব। আপনার কন্যা রাত্রে যে ঘরে শয়ন করেন সেই ঘর খানি এখন একবার আমায় দেখাইতে হইবে। রাজামহাশয় সেই ঘর ও শয়নের খাট সবই বিজয়চাঁদকে দেখাইলেন। বিজয় বলিল ঐ খাটের পাশে আমাকে ছোট একখানি চৌকি দিতে হইবে (চৌকি মানে তক্তাপোষ) রাজামহাশয় শুনিবামাত্রেই তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বিজয় বলিল আপনার কন্যার ঘরে অসংখ্য বাতি জ্বালিয়া দিতে হইবে। আর আমাকে এক খণ্ড অস্ত্র দিতে হইবে, ঐ ঘরের চারি পাশে ৪।৬ জন লোক রাত্রে জাগরণ করিয়া বসিয়া থাকিবে, হুকুম পাইলেই যেন তাহাদের পাই, রাজাজ্ঞায় সবই ঠিক হইয়া গেল। বিজয়চাঁদ বাজারে গিয়া খাদ্য দ্রব্য সমস্ত কিনিয়া আনিয়া রন্ধন করিয়া খাইল, খাইবার স্থানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না, আহারান্তে কন্যার ঘরে গিয়া দেখে, অপূর্ব্ব রূপসী রাজকন্যা, যেন রূপেরই কারখানা, কন্যাকে দেখিয়া দেবী বলিয়া ভ্রম হয়। রাজকুমারী বিজয়চাঁদকে দেখিয়া তাহার অন্তরে বিষম আঘাত লাগিল। বিজয় অল্প বয়সের বলিষ্ঠ যুবা কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর পুরুষ, আজানুলম্বিত বাহু, চুলগুলি এত সুন্দর যেন চিকুর

নাই, রাত্রের মধ্যে এই যুবার মৃত্যু হইবে ইহাই রাজকুমারীর আক্ষেপ, রাজকুমারী বলিলেন হে যুবক তুমি বিছানায় এস তোমাকে কিছু বলিব বিজয় বলিল কুমারী তোমার পাণি গ্রহণ না করিয়া তোমাকে স্পর্শ করিব না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন কর। কুমারী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল পাণি গ্রহণ হওয়ায় পূর্ব্বেই তোমার মৃত্যু হইবে। এস বিদেশী তোমার সঙ্গে দুটী কথা কই, আমি হতভাগিনী কত যুবক যে আমাকর্ত্তৃক অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইলেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার মৃত্যু হইলে এরূপ অকাল যুবক মৃত্যু উঠিয়া যাইত, কিন্তু বিদেশী তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত অতি অস্থির হইয়াছে, অন্তদের সময়ে এরূপ হয় নাই, তুমি দুটী কথা কহিয়া আমাকে শান্তি দাও। বিজয়চাঁদ বলিল কুমারী তুমি নিদ্রা যাও বাজে কথায় কি হইবে, তোমার সহিত আগামী কল্য আমি কথা কহিব, তুমি ভাবিও না,' যে আমি অন্যদের মত মরিয়া যাইব। কুমারী ক্রমে ক্রমে ঘুমাইলেন। বিজয়চাঁদ কুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া অস্ত্রখানি হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন, অনন্ত আলো জ্বলিতেছে সামান্য একটা মশা ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, কিছু পরে কুমারীর নাক ডাকিতে লাগিল তাহাতে বোধ হইল গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইতেছে, ক্ষণপরে নাক দিয়া একটা ৩ হাত লম্বা সূতা বাহির হইল, পরে ঐ সূতা একটা কেঁচোর মত হইল ক্ষণপরে বৃহৎ একটা সাপ হইয়া কুমারীর চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যখন পাশে আর কারুকে পাইল না, তখন বিজয়চাঁদের দিকে

সাপ অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজয় কিরিচ দিয়া তখনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, এবং রাত্রের মধ্যেই হাঁড়িতে পুরিয়া বাহিরের পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়া আবার ঘরে আসিয়া বসিল। ভোরে মুদ্দরা আসিয়া বাহির দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল কেওয়ারী খোলে দাও, রাজামহাশয় কন্যার ঘরের কাছে আসিয়া ডাকিলেন, মা চারুহাসিনী! চারুহাসিনী উঠিয়া দেখে বিদেশী বসিয়া আছে, চারুহাসিনী বলিল বাবা বিদেশী জীবিত, মুদ্দদের যেতে অনুমতি করুন। রাজামহাশয় শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল। মুদ্দদের বলিলেন তোমরা আর সংবাদ না পেলে আসিও না, ক্রমে সূর্য্যদেব উদয় হইলেন, বিজয়চাঁদ সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাজার হইতে খাদ্য দ্রব্য সবই খরিদ করিয়া আনিয়া নিজে পাক করিয়া নিজেই ভোজন করিলেন, গত রাত্রের জাগরণ, এখন সদর স্থানে শুইয়া অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিজয় জীবিত আছে, কেন জীবিত আছে তাহার কারণ কেউ বুঝিতে পারিল না। বিজয়চাঁদ বিকালে ৪টার সময় ঘুম হইতে উঠিলেন, উঠিয়া নিজ হাতে জল লইয়া মুখে হাতে দিলেন, সমস্ত রাজবাটীর অন্দরের স্ত্রীলোকেরা উঁকি ঝুঁকি দিয়া বিজয়চাঁদের অকলঙ্ক মুখ চন্দ্র আর নিখুঁত দেহ সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সুন্দর যুবা পুরুষ, মৃত্যুকে কি প্রকারে জয় করিল ইহা জানিবার জন্য সকলের বিশেষ কৌতুহল, কে সে কৌতুহল নিবারণ করে? সন্ধ্যার সময় রাজামহাশয়কে বিজয়চাঁদ রাজকুমারীর ঘরে অনন্ত বাতির বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন পূর্ব্বদিনের মত সবই ঠিক ঠাক হইয়া গেল রাত্রে ১১টার

সময়, চারুহাসিনী তাহার বিছানায় আসিলেন বিজয়চাঁদ পরক্ষণই সেই ছোট তক্তাপোষের উপর গিয়া কিরিচ হাতে বসিলেন, অদ্য রাজকুমারী কোন কথা না বলিয়া অনবরত বিজয়চাঁদের অকলঙ্ক মুখচন্দ্র অবাক হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চোকে পলক নাই, যেন চিত্রপুত্তলিকার মত একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। কতক্ষণ এইরূপ থাকিয়া রাজকুমারী কপট নিদ্রাভিভূত হইলেন, বুঝিবেন বিদেশী আমার ঘুমন্ত অবস্থায় কি করে? বিদেশী যেমন তেমন বিদেশী নয়, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া আছেন কিন্তু বিদেশী বুঝিয়াছে রাজকুমারীর কপট নিদ্রা। সন্ন্যাসীর নিকট তিনটী কথার দ্বিতীয় কথাটী সতর্কের বিনাশ নাই, তাহা এই রাজবাটীতে খাটিতেছে। এখন রাজকুমারীর নয়ন দুইটী ভারাক্রান্ত হইয়া ক্রমেই নীমিলিত হইতে হইতে নাক ডাকাইয়া অচেতন হইলেন, অদ্যও একটা ৩ হাত সূতা বাঁ নাকের ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া কেচোর মত হইয়া পরে পূর্ব্ব রাত্রের সাপের মত এক সাপ হইল এবং চারি দিকে লোক খুজিয়া না পাইয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজয় অসিদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্ব্ব রাত্রের নিয়মে পুকুরে রাখিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। রজনী প্রভাতপ্রায়, পাখীসকল গাছে গাছে গান আরম্ভ করিল; রাজামহাশয় কন্যার ঘরের নিকট আসিয়া রাজনন্দিনী চারুহাসিনীকে ডাকিলেন চারু উত্তর দিল, বিদেশী গত রাত্রের মত তক্তাপোষে নির্ভিকচিত্তে বসিয়া আছেন, বাবা ইনিই স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়। প্রভাতে বিজয়-চাঁদ উঠিয়া গতকল্যের মত প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিল।

রাজামহাশয় বলিলেন বৎস! আর বিলম্ব না করিয়া দিন দেখিয়া আমার কন্যার শুভক্ষণে পাণিগ্রহণ কর, আমি বহু দিন ধরিয়া বড়ই বিভ্রাট ভোগ করিতেছি। বিজয়চাঁদ বলিল আমি অন্ততঃ ৭ দিন না দেখিয়া আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না। সাবধানের বিনাশ নাই এই মহাবাক্য আমি লঙ্ঘন করিয়া কোন অনুরোধের বাধ্য হইব না। অদ্যও আমি নিজে বাজার করিব, ও নিজে পাক করিয়া নিজেই আহার করিব। গত দুই দিন যে নিয়মে যাহা করিয়াছি আর ৫ দিনও তদ্রূপ করিব, রাজামহাশয় দেখিলেন আর অবুঝের মত কথা বলা উচিত নয়। আচ্ছা বৎস! আমার কন্যার পাণি গ্রহণে ত তোমার অমত কিছু নাই? বিজয়চাঁদ বলিল পাণি গ্রহণে আমার কোনই অমত নাই। অদ্যও রাত্রে অনন্ত বাতি জ্বালিয়া সেই ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া রাজকুমারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আজ উভয়ের মাঝে মাঝে দুয়েকটী কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল, রাজকুমারী সাহস করিয়া নিজে কথা কহিতে পারিতেছেন না। ক্রমে ক্রমে রাজকুমারী নিদ্রাভিভূত হইলেন, রাজকুমারীর নিদ্রার আজ কোন বিঘ্ন রহিল না নাক ডাকা বা অন্য কিছু উপসর্গ নাই, অদ্য রাত্রে বিজয়চাঁদ প্রহরীর মত বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে বিজয়চাঁদ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া বাজার করতঃ রন্ধন করিয়া আহারাদি সম্পাদন করিলেন। এবং দিনে সাধারণের সমক্ষে ঘুমাইলেন। ক্রমে ক্রমে ঐরূপ নিয়মে সপ্তম দিন কাটিল, রাজকুমারীকে প্রত্যেক দিন দেখিতে

দেখিতে নিজের বিবাহের ইচ্ছা অতি প্রবল হইল। অষ্টম দিন প্রাতে রাজামহাশয়কে বিজয়চাঁদ বলিলেন, মহারাজ বিবাহের শুভ দিন দেখিয়া বিবাহ দিবার উদ্যোগ করুন। তবে যাহা কিছু পাওনা দেনা বিবাহের পূর্ব্বেই যেন সে সব নির্গোল হয়। রাজামহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, যাহা কিছু সম্পত্তি ও নগদ টাকা সমস্তই জামাতাকে উইল করিয়া দিয়া তৎপরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, এই বিবাহ অত্যন্ত সুখের বিবাহ হইল। বিবাহের পর বিজয়চাঁদ রাজামহাশয়কে নিবেদন করিলেন, রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি গ্রামের লোক প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে পারে না, সেখানে খুব বড় একটা পুকুর হওয়া আবশ্যক, প্রজারঞ্জন করাই রাজার ধর্ম্ম, অনুমতি করুন সেখানে গিয়া পুকুর দেওয়ার বন্দোবস্ত করি। রাজামহাশয় বলিলেন, আমার সর্ব্বস্ব তুমি এবং যাহা কিছু আমার ছিল সবই তোমাকে দান করিয়াছি তোমার ইচ্ছা মত কাজ করিতে পার, আমাকে অবগত করাইবার কোনই আবশ্যক নাই। বিজয়চাঁদ সংবাদ পাইলেন, দাদাদের কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে অত্যন্ত দেনা হইয়া তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন। পিতা ও মাতা উভয় দাদা ও বউদিদিদের সঙ্গে ও শরৎকামিনীর সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া ও বাকবিতণ্ডা করিতেছেন অভাবের সংসারে যেমন হয় তাহাই হইতেছে, দিবা রাত্রি অশান্তি, সকলের অশান্তিই শরৎকামিনী তাহার স্বামী বর্ত্তমান নাই, সেই সে বাড়ীর বেশী অভাগিনী। খুব শীঘ্র শরৎকামিনীর দুরবস্থা দূর করা আবশ্যক। বিজয়চাঁদ পুকুর কাটার হুকুম শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকারান্তে

লইয়াছেন দুয়েক দিনের মধ্যেই পুকুর কাটিবার জমিতে উপস্থিত হইয়া সেখানে অসংখ্য তাঁবু গাড়িয়া বসিলেন, চারি দিকে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে প্রত্যেক লোক এক কোপ মাটি কোদাল দিয়া কাটিবে সে ১৲ এক টাকা পাইবে, অল্প দিনের মধ্যে অনন্ত লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং প্রতি লোক দিন ৫০৲ হইতে ৬০৲ টাকা পরিমাণে উপায় করিতে লাগিল, বিজয়চাঁদের বাপ ও মা এই ঘোষণা শুনিয়া দুই ছেলেকে পাঠাইলেন তাহারা আসিয়া প্রথম দিন দুই ভাই ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিল।

তাহারা টাকা লইয়া বাটীতে গেলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকেও জুলুম করিয়া মাটী কাটিতে পাঠাইলেন, অগত্যা ব্রাহ্মণও আসিলেন। বিজয়চাঁদ বাবাকে দেখিয়া তাঁহাকে কোন কাজ করিতে না দিয়া এক খানি চেয়ারের উপর বসাইয়া রাখিয়া সকলে যখন বাটী যায় তখনি তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া বিদায় দিলেন, বিজয়চাঁদকে তাহার বাপ চিনিতে পারেন নাই, দাদারাও যখন টাকা লইতে আসিলেন তাহারাও চিনিতে পারিলেন না, তাহারা আজও ১০০৲ টাকা পাইল; অদ্য পুকুর কাটার কাজ শেষ হইয়া গেল। বিজয়চাঁদ রাজকুমারীকে লইয়া ঐ স্থানে চাকর বেহারা ও দরওয়ানসহ বাস করিতে লাগিলেন। ঐ পাড়ায় একজন দুধওয়ালী থাকে, তাহার নাম কালাকলঙ্কিনী, সে বিজয়চাঁদকে দুধ ঘৃত মাখন ইত্যাদি দেয়, তাহার মুখ খানি হাসি খুসি দেখিতেও সুন্দরী, কথা যেন অমৃত মাখান, ব্যবসাদারের মেয়ে তাহার

কথা অদ্ভুত মাখান হওয়াই উচিত। এক দিন বিজয়চাঁদ তাহাকে বলিলেন, দেখ কালাকলঙ্কিনী তুমি দুপুরে আহারাদি শেষ করিয়া একবার আমার কাছে আসিবে তোমায় একটি কাজ করিবার ভার দিব। কালাকলঙ্কিনীর আর এক নাম ছিল কালো, পরিচিত লোক মাত্রেই কালো বলিয়া ডাকিত. কালো দুপুরে বিজয়চাঁদের কাছে আসিল। বিজয়চাঁদ বলিল, তুমি রতনডাঙ্গা গ্রাম জান? কালো বলিল জানি, সেখানে তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী জান? কালো বলিল মহাশয়, আমি তুলসী বাবুকে জানি তাহার স্ত্রী আদরমণিকেও জানি, তাঁহাদের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ সবই আমি জানি, আমার মায়ের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্পর্ক আছে তাঁহারা আমাকে খুবই বিশ্বাস করে, কি করিতে হইবে তাহাই আমাকে বলুন।

দেখ কালো, আদরমণি অত্যন্ত টাকার লোভী তুমি এই ২০০৲ টাকা লইয়া গিয়া তাহার ছোট বউমাকে ভুলাইয়া আমার কাছে আনিয়া দিতে পার? কালো শুনিয়া বলিল আর ৫০৲ টাকা দেন আমি নিশ্চয়ই আনিয়া দিব। ২৫০৲ লইয়া কালাকলঙ্কিনী গিয়া গিন্নিমাকে সব বলিল গিন্নিমা তখনি সম্মত হইয়া আড়াই শত টাকা লইয়া শরৎকামিনীকে পাল্কীতে তুলিয়া কালোর সঙ্গে গোপনে পাঠাইলেন, কালো আনিয়া বিজয়চাঁদের কাছে হাজির করিল, বিজয়চাঁদ কালোকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন, আর হুকুম দিলেন ২ নং তাঁবুতে উহাকে রাখ, খুব যত্নের সহিত উহাকে ২ নং তাঁবুতে রাখিয়া দাসীরা খুব যত্ন করিতে লাগিল। রাত্রে

বিজয়চাঁদ তাঁবুর মধ্যে গেলেন, স্ত্রী বিজয়চাঁদকে চিনিলেন। রাজকুমারীকে বিবাহ এবং তাহাকে দেখান সবই হইল। পৃথক পৃথক তাঁবুতে রাজকুমারী ও শরৎকামিনী রহিলেন। অন্য এক দিন কালোকে বিজয়চাঁদ বলিলেন, কালো, তুমি উহাদের বড় বউকে আনিয়া দিতে পার? কালো বলিল তাহা আমি পারিব আমায় ২৫০৲ টাকা দেন, আড়াই শত টাকা লইয়া কালো গিয়া আদরমণিকে বলাতেই আদরমণি বড় বউকে বলিল তোমাকে এক যায়গায় ইহার সঙ্গে যেতে হইবে, সন্ধ্যার মধ্যেই বাটীতে আবার আসিবে, শাশুরীর কথা না শুনিলে সর্ব্বনাশ, বড় বউ ওজর না করিয়া তখনি স্বীকার করিলেন, আড়াই শত টাকা পাইয়া বড় বউকেও কালোর সঙ্গে পাঠাইলেন। রাত্রে এখানে আসিয়া উভয় উপস্থিত হইল, বড় বউদিদিকেও বিজয়চাঁদ ৩ নং তাঁবুতে রাখিয়া দিয়া রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, বড় বউদিদিও চিনিলেন ও বিজয়ও চিনিলেন এখানে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া বিজয়চাঁদ অবস্থা খুব বড় করিয়া বসিয়া আছে, ইহা বড় বউদিদিও বেশ বুঝিতে পারিলেন। বাটীতে আজ বড় ছেলে সরলাকে না দেখিয়া আদরমণিকে জিজ্ঞাসা করিল মা সরলা কোথায়? মা বলিলেন কাল হইতে পেটের অসুখে সে প্রায়ই আমাদের বাঁশ বাগানে বসিয়া আছে, ছোট বউও আজ কয়দিন পেটের অসুখে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না, বাপুহে যখন আর উপার্জ্জন নাই তখন স্ত্রীর এত খোঁজ লওয়া কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদরমণি বাঘিনী, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, মাহেশ্বর স্বভাব

ভয়ে নিরস্ত হইল। এখানে তাঁবুতে শরৎকামিনী, রাজকুমারী ও সরলা দিনের বেলায় তিনজনে খুবই মিলিয়া মিশিয়া আমোদ প্রমোদে সময় কাটান, বিজয়চাঁদ পুরুষ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু আবশ্যক দিনে তাহা তদন্ত করিয়া দেখেন। বিজয়চাঁদ আর এক দিন কালোকে ডাকিলেন এবং বলিলেন তুমি আজ আবার আদরমণির কাছে যাও, উহাদের মেজো বউমাকে যে পতিকে পার, আর যত টাকা তিনি চাহেন তাহা দেওয়া স্বীকার করিয়া অদ্যই সন্ধ্যার মধ্যে আনিবে। কালো টাকার লোভী নয়, সে আড়াই শত টাকা লইয়া অদ্যও আদরমণির নিকট উপস্থিত হইল, আদরমণি দেখিয়া খুবই সন্তোষ হইল, কালো বলিল গিন্নিমা এই ২৫০৲ টাকা গ্রহণ করুন, আজ মেজো বউমাকে আমার সঙ্গে এই দণ্ডেই পাঠাইতে হইবে। আদরমণি টাকা লইয়া তখনি মেজো বউমাকে বলিলেন তুমি কালোর সঙ্গে এই দণ্ডেই যাইবে, অন্যথা হইলে বিষম বিপদে পড়িবে, মেজো বউমা বলিলেন মা একে একে সকলকে বিদায় দিয়া কাকে লইয়া সংসার করিবেন? আদরমণি বলিলেন বাছা, সে খোঁজে তোমার দরকার নাই, আমার হুকুম মত তোমায় কাজ করিতে হইবে। কালো তখনি পাল্কী আনিল বিনা বাক্য ব্যয়ে ইন্দুবালা কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে চাপিলেন। কালো আজ ইন্দুবালাকে লইয়া সেই ময়দানে তাঁবুতে হাজির হইল, ৪ নং তাঁবুতে ইন্দুবালাকে রাখিবার হুকুম হইল, রাত্রে বিজয়চাঁদ তাঁবুতে প্রবেশ করিবা মাত্রেই ইন্দুবালা ঠাকুরপোকে চিনিলেন, এবং কহিলেন ঠাকুরপো, বড় দিদি, শরৎ ইহারাও কি এখানে আছে? বিজয় বলিল

হাঁ ইহারা ও নূতন স্ত্রী রাজকুমারী চারুহাসিনী সকলেই আছেন, আগামী কল্য দিনে সাক্ষাৎ হইবে, রাত্রে দেখা শুনায় বাধা আছে। দাসীরা ইন্দুবালাকে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দিয়া শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, পর দিন প্রাতে চারুহাসিনী, শরৎকামিনী সরলা ও ইন্দুবালা পরস্পর সকলেই একত্র হইয়া মনের সুখে কথাবার্ত্তায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। বিজয়চাঁদ যেমন আদরমণিকে চিনিলেন বধূ তিনজনও সেইরূপ শাশুরীকে চিনিলেন। সংসারে স্ত্রী জাতি দ্বারা না হইতে পারে এমন কি আছে? সন্ধ্যার সময় মধ্যম পুত্র সরলকুমার ইন্দুবালাকে না পাইয়া মাকে বলিলেন মা বউদিদি, ছোট বউমা ও ইন্দুবালা ইহারা সব কোথায়? মা বলিলেন কেন বাবা! আজ কত টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছ? এত বউদের খোঁজ কেন? অক্ষম হইলেই কি বউকে চোখে হারায়? তোমাদের লজ্জাও নাই তারা সব পেটের জ্বালায় দাসীত্ব করিতে গিয়াছে, তোমাদের মা হইয়া আমাকেও এখন শেষ কালে দাসীপণা করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। তোমাদের গর্ভে ধরে আমি রত্নগর্ভা হইয়াছি।

সরলকুমার নিরস্ত হইলেন, অসৎকে ভগবানও ভয় করেন। সরল পিতার নিকট গিয়া বলিল বাবা এক বউও বাড়ীতে নাই, কোথায় সব গিয়াছে কিছুই জানি না, তুলসীদাস বলিলেন বাপু আমি আজ কয় দিন ধরে দেখছি সংসারে ছোট বউ বড় বউ নাই কাল হইতে জানিলাম মেজে বউও নাই; কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, চল বাপ সব, জঙ্গলে যাই

আর আমাদের আশ্রমে থাকিয়া কাজ নাই। আদরমণি আসিয়া দেখেন স্বামী ও দুই পুত্রে তিন জনে মিলিয়া বউদের কথা বলিতেছে শুনিয়া অমনি আগুন, তোমরা বনে যাবে কেন এই আমিই চলিয়া যাইতেছি। তিন অক্ষম এক স্থানে জুটিয়া নিন্দা বাদা করিতেছ কেন? সকলেই ভয়ে চুপ। আর শব্দ মাত্রও নাই। পর দিন সকালে বিজয়-চাঁদ বেহারা পাঠাইয়া দিলেন এবং পত্র লিখিয়া দিলেন পিতা ঠাকুর মহাশয় একবার দাদাদের সঙ্গে করিয়া নুতন পুকুরের ধারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিবেন, আমি জীবিত আছি, পত্র পাঠ করিয়া তিন জনেই তখনি রওনা হইলেন, গিয়া সকলেই বিজয়কে চিনিলেন বিজয়ও সকলকে প্রণাম করিয়া উহার বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত কথা বলিল, মধ্যাহ্নে আহারের সময় দুই ছোট বউ, মেজে বউ ও বড় বউ সকলেই একত্র হইয়া শ্বশুর মহাশয়কে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন বাবা মায়ের কীর্ত্তি এই, আড়াই শত করিয়া টাকা লইয়া আমাদের সকলকে কুৎসিত কাজে লিপ্ত করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, যদি ঠাকুরপো না আসিতেন তবেত সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইত। ব্রাহ্মণ বলিলেন মা তোমরা কি তাহাকে চেন না? মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি কথা বলি না। মাতৃব্যবহারে তিন পুত্র ও পুত্রবধূরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য বলিলেন নারী জাতি সব পারে। পর দিন বিজয়চাঁদ নিজে গিয়া মাকে আনিলেন মা পুত্রবধূদের লইয়া আর অগাধ অর্থ পাইয়া মনের সুখে বাস

করিতে লাগিলেন আর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের স্বভাব অর্থ পাইয়া বোধ হয় ভুলিলেন, আজ কাল কামিনী কাঞ্চনেরই আদর বেশী, কামিনী ও কাঞ্চন অনর্থ উৎপাদনের মূলীভূত কারণ, কামিনী ও কাঞ্চন হইতে সর্ব্বনাশ না হইতেছে এমন সংসার নাই।

কৃপণের অর্থের পরিণাম।

কানাইডাঙ্গা নামক এক খানি ছোট গ্রামে অনেক লোকের বাস, বাসেন্দারা অধিকাংশ গরীব, গ্রামে সম্ভ্রান্ত লোকের বাস নাই। এই গ্রামে এক ঘর ময়রার বাস আছে, ময়রার নাম ভোলানাথ মোদক, তাহার এক স্ত্রী আছে, সন্তানাদি কিছুই নাই, ভোলার বয়স অন্ততঃ ষাট বৎসর, তাহার স্ত্রীর বয়স ৪৬ বৎসর। স্ত্রীর নাম ভগবতী, স্ত্রী অত্যন্ত সচ্চরিত্রা, মৃদুভাষিণী ও অকপট চিত্ত, পরের দুঃখে কাতরা অর্থাৎ সেকালের লোক যেমন স্বভাবের হওয়া উচিত ভোলানাথের স্ত্রী ঠিক সেইরূপ সৎস্বভাবা ও সরলা। হলে কি হইবে, যে স্বামীর হাতে পড়েছে সে ঠিক ময়রার স্ত্রীর বিপরীত, স্বামী অতি কৃপণ, যাহার উপর কৃপণ আর দেখা যায় না, ভোলার মাটীতে পোতা দুই জালা টাকা আছে, অন্ততঃ লক্ষ টাকার বেশী হইবে, ভোলানাথ অতি ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাল্য কাল হইতে এ পর্য্যন্ত অত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। ভোলানাথ ভোর বেলায় স্নান করিয়া একটা ঝাঁকা করিয়া খই, মুড়কী, নারিকেল, লাড়ু ও বাতাসা ইত্যাদি লইয়া ফেরী করিতে বাহির হইত। প্রতি দিন সকালে আধ পেট পান্তা ভাত খাইয়া সমস্ত দিন দারুণ রৌদ্রে বেড়াইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মধ্যাহ্নে এক বেলতলায় বসিয়া উহার স্ত্রী ঝাঁকার মধ্যে এক গ্লাস জল দিত সেই জল গ্লাস পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় বিক্রয় করিতে পল্লীতে যাইত। ঐ সকল দ্রব্য

বিক্রয় করিয়া চাউল, ডাইল, তরকারী, শাক শবজী ও পয়সা ইত্যাদি পাইত, চাউল ডাইল ইত্যাদি বাটীতে আনিয়া তাহাই স্ত্রী দ্বারা রন্ধন করাইয়া খাইত, কোন দ্রব্য বাজারে নগদ পয়সা দিয়া কখনও কিনিত না, যে দিন কিছু না পাইত সে দিন উপবাস করিয়া দিন কাটাইত, স্ত্রীও আর উপায় না দেখিয়া সেও উপবাসে দিন কাটাইত, ভোলার স্ত্রী বলিত টাকা থাকিতে উপবাস করা ইহা কেবল তোমাকেই দেখিতেছি, আমরা চোক বুজিলে কে এই অর্থ খাইবে? ময়রাণী ভাল কথা বলিলে, ময়রা এত কুৎসিত গালি দিত যে ময়রাণী আর কথা কহিত না।

গালাগালি খাইয়াও ভগবতী, ভোলানাথের উপর ভক্তির হ্রাস, বা যত্নের ক্রটী করিত না, ভাবিত আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ভোগ করিতে হইবে। স্ত্রীর পাড়ায় যাইবার যো নাই, পাড়ার কারু এখানে আসিবার যো নাই, পাড়ার কেহ আসিলে ভোলা ভগবতীকে বলিত, তুই ওদের খই, মুড়কী খেতে দিয়াছিস এই বলিয়া বিস্তর গালাগালি দিত, যাহারা আসিত তাহারাও ব্যকুব, ময়রাণীও ব্যকুব এরূপ ইতর আর দেখা যায় না। ভোলানাথ, দিনে রাত্রে অর্থের জন্য নিয়ত ঘুরিতেছে যাহা আয় করিতে পারিতেছে টাকা পুরিলেই জালার মধ্যে রাখিয়া সুখী হইতেছে এক দিন বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে ভোলানাথ, পাড়ায় পাড়ায় ও গরম মাটিতে শুধু পায়ে ঘুরিয়া রাত্রে বাটীতে আসিয়া মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল, ভগবতী বুঝিল যে গরমে দেহকে অস্থির করিয়াছে, কার্

খন যাইবে তখন কতকটা মিছরীর সরবৎ গ্লাসে দিয় পপাসার সময় পান করিলে শরীর সুস্থ হইবে এবং গরম কাটিবে। ভোলা জানিতে না পারে এইরূপ ভাবে কতকটা মিছরীতে জল দিয়া রাখিয়া দিল রোজ যেমন জল ঢাকা দিয়া ঝাঁকায় বসাইয়া দেয়, আজও ঐ সরবৎ সেইভাবে বসাইয়া দিল। ভোলা সমস্ত পল্লী ঘুরিয়া যেমন ১টা দেড়টার সময় বেলতলায় আসিয়া বসিয়া জল পান করে, আজও সেইভাবে তথায় বসিল এবং গ্লাস হাতে লইয়া যেমন মুখে দিয়াছে অমনি মিষ্ট বোধ হওয়ায়, নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া মুখের ভিতর হইতে সরবৎ সমস্ত বাহির করিয়া ফেলিল এবং হস্তস্থিত গ্লাস জোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, নিকটে আরও কতকগুলি ছোট ছোট বেল গাছ ছিল, ঐ জল উহার একটী গাছের গোড়ায় গিয়া পড়িল, যেমন জল পড়িল অমনি এক দৈত্য জটা জুট সমেত বাহির হইয়া ময়রাকে বলিল এই বৈশাখ মাসের দারুণ রৌদ্রে বিল্বমূলে জল প্রদান করিয়া তুমি আমায় যেরূপ ঠাণ্ডা করিয়াছ, আমি অতি তুষ্ট হইয়াই তোমাকে বর দিতে প্রস্তুত; তুমি যে বর চাইবে আমি তাহাই দিব। ময়রা দৈত্যকে দেখিয়া আর বিস্তর মিছরী ময়রাণী ভিজাইয়া অপচয় করিয়াছে, একে মিছরী নষ্ট তাতে আবার দৈত্যের অত্যাচার এই দুই ব্যাপারে ময়রা একেবারে অস্থির। দৈত্যকে বলিল মহাশয় কাল আমার স্ত্রীকে আনিব সে যাহা হয় আপনার নিকট বর চাহিবে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দৈত্য তথাস্তু বলিয়া বিদায় হইল। ময়রা সেইখানে বসিয়া মিছরী নষ্ট হওয়ার

জন্ত বিস্তর কাঁদিতে লাগিল, খানিক কাঁদিয়া পুনরায় পাড়ায় ঘুরিতে চলিল। রাত্রে বাটী আসিয়া ময়রাণীকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল, আর বলিতে লাগিল তুই রোজ চুরি করিয়া আমার মিছরী সাবাড় করিতেছিস, আমার আর কি সর্ব্বনাশ করিলে তুই সুখী হইবি? আরও মহা বিপদ যে আমার ব্যবসা বন্ধ। মিছরীর জল আমি খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম সেখান হইতে এক ভয়ানক দৈত্য বাহির হইয়া আমাকে বর দিতে চাহে. আগামী কল্য তোকে সেখানে গিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতে হইবে, নচেৎ তোর পরিত্রাণ নাই। ময়রাণী হরিষে বিষাদে আবার বাটীতে আসিয়া ময়রাকে বলিল দৈত্য কি বলিয়াছে বল, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার ব্যবসা বন্ধ হইবে না। ময়রা বলিল, দৈত্য জল ফেলাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিতে চাহে, আমি বর লই নাই তুই গিয়া সে আমাকে অত্যাচার না করে তাহা নিবারণ করিয়া আসবি, নচেৎ তোর রক্ষা নাই। পর দিন ময়রাণী এক ঘটী জল লইয়া ময়রার সঙ্গে চলিল, ময়রা বলিল আমি খই মুড়কী বিক্রয় করিয়া যখন আসিব তখন সেই দৈত্যকে দেখাইব। ময়রাণী বলিল আমি কোথায় থাকিব? ময়রা বলিল, হয় তুই আমার সঙ্গে আয় আর না হয় এখানে কোন একটী গাছের তলায় বোস্। আমার সঙ্গে গেলে দেখতে পেতিস পয়সা রোজগার করা কি শক্তখানি। এই বলিয়া ময়রা চলিয়া গেল, ময়রাণী সেখানে বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় দুইটা এমন সময় ময়রা আসিল এবং বেল তলায় যেমন

বসিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে গিয়া বসিয়া ময়রাণী ডাকিল, ময়রাণীকে বলিল ঐ গাছের গোড়ায় সে হতভাগা অসুর আছে, ময়রাণী গাছের গোড়ায় এক ঘটী জল ঢালিয়া দিতেই দৈত্য বাহির হইয়া ময়রাণীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, আর বলিলেন, মা, বর লও, ময়রা বলিল এই আমার স্ত্রী উহাকে বর দেও, আমার বরের দরকার নাই। উহাকে তুমি যত বর দিবে, ওমাগী সব বর নিতে পারিবে। বর নিতে ও পেছু পা হইবে না। দৈত্যরাজ বলিলেন, মা তুমি কি বর চাও, ভগবতী বলিল, ঠাকুর আমি দুটী বর চাই। প্রথম বর আমাদের একটী পুত্র সন্তান দাও, দ্বিতীয় বর যে অর্থ আমাদের আছে, তাহা যেন আমাদের ভোগ হয়, ইহা ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। ঠাকুর বলিলেন মা প্রার্থীত বরের কিছুই তুমি পাইবে না, তুমি অর্থ ও অগাধ ধন সম্পত্তি জমি যায়গা চাও তাহা আমি দিব। বংশ রক্ষা হউক এ বর তুমি পাইবে না, তখন ময়রাণী কাঁদিয়া পায়ে জড়াইয়া ধরিল, দৈত্যরাজ বলিলেন দেখ মা, অসঙ্গত কিছুই তুমি পাইবে না, ভগবতী বলিল আচ্ছা ঠাকুর আমাদের যে অর্থ আছে তাহা ভোগ হউক এই বর দাও, ঠাকুর বলিলেন মা ইহা অতি অসম্ভব। মা সঞ্চিত অর্থ অন্যের, উহাতে তোমাদের কোনই অধিকার নাই, ময়রাণী ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িয়া অনবরত চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকায় ঠাকুর বলিলেন, মা, সঞ্চিত অর্থের এক পাই মাত্র অংশ তুমি ভোগ করিতে পারিবে, এই বর দিয়া দৈত্যরাজ প্রস্থান করিলেন। ময়রাণীর অনুরোধে ময়রা সে দিন সকাল সকাল বাড়ীতে

আসিল, ময়রা ময়রাণীর ভবিষ্যৎ কোনই ভাল আশা নাই। সুখে হউক দুঃখে হউক দিন চলিতে লাগিল। এক দিন প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ বেলা আড়াইটার সময়, ময়রাণীর কাছে আসিয়া হাজির। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মা ভোলা ময়রার কি এই বাড়ী ? ভগবতী বলিল হাঁ বাবাঠাকুর এই তাঁর বাটী বটে, আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন শুনিতে পাইব কি ? ব্রাহ্মণ বলিলেন মা আমি কন্যাভার দায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণ ৫০০৲ শত টাকা না হইলে আমার উদ্ধার নাই, তাই মা আমি শুনিলাম ভোলানাথের অগাধ অর্থ আছে, যদি পাঁচ শত টাকা দেয় তবে মা আমার দায় উদ্ধার হয়, হাঁ মা, তুমিতো লক্ষ্মীরূপিণী, মা তুমি চেষ্টা করিলে আমি উদ্ধার পাইতে পারি। ভগবতী বলিল, ঠাকুর, অর্থতো হবেই না, তা ছাড়া তাঁর সম্মুখে আপনি কন্যার দায় জানাইলেই আপনাকে অপমান করিবে, আপনি এখনি প্রস্থান করুন।

বাস্তবিক ব্রাহ্মণ শুনিয়া ভীত হইলেন, ভোলানাথের মত লোক রাস্তায় আরও পাইয়াছিলেন। মা আমি তবে এই শেষ বেলায় কোথায় যাই ? ভগবতী বলিল বাবাঠাকুর আপনার আহার হয় নাই ? ব্রাহ্মণ বলিলেন না মা, আহার হয় নাই। ভগবতী বলিল, তিনি না আসিতে এই সময় আপনি কিছু খই, বাতাসা ও নারিকেল খাইয়া ঐ দাওয়াতে থাকুন, তিনি আসিয়া আপনাকে অতিশয় তিরস্কার করিবেন, তাহাও সহ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ বলিলেন মা, মারিবে নাতো ? ভগবতী বলিল, তাহাও তিনি পারেন, তবে আমি

রক্ষা করিব। বাবাঠাকুর, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি খেলে কোথায়, আপনি বলিবেন, আমি পথে খাবার খেয়েছি. আমি দিয়াছি এ কথা বলিলে আমাদের উভয়েরই বিষম অপমান করিবেন, ব্রাহ্মণ ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিলেন। এমন সময় ভোলা বাড়ী আসিল, দাওয়ায় কে? দাওয়ায় কে? বলিয়া ময়রাণীকে ডাকিল, বলি কাকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখেছিস? ও কে, ও শালা কোথা থেকে এলো? ও খেয়েছে কোথায়? ওরে তুই কেরে, ওরে শালা, আমার সর্ব্বনাশ করবি নাকিরে? ওরে তুই এ বাড়ী চিনলি কি করে? ওরে ব্যাটা চোর, ক্রমেই ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতেছেন, ভগবতী বলিল ওগো তোমার কি হোলো! একটা ব্রাহ্মণ অসুস্থ হইয়া এখানে শুইয়া আছেন, সকালেই চলিয়া যাইবেন ওরে শালী, আমি বসব কোথায়, ও খেয়েছে কোথায়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাবা, আমি পথ হইতে খেয়ে এসেছি। ময়রাণী ময়রাকে লইয়া ঘরের মধ্যে গেল। ব্রাহ্মণ দেখিল যদি টাকার কথা বলি তবে আর রক্ষা নাই, এখন গতিক করে রাত কাটাইতে পারিলে বাঁচি। ময়রা ময়রাণী উভয়ে ঘরে শুইয়া রহিল, অতি সামান্য দাওয়া, সেই দাওয়াতে ব্রাহ্মণ শুইয়া আছে, ব্রাহ্মণের শেষ আশা ভোলা ময়রার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লইয়া কন্যার বিবাহ দিবেন, আজ সে আশা ফুরাইল; আজ ব্রাহ্মণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। ঘুম নাই, রাত প্রায় ১টার সময় দুই জন দৈত্য আসিয়া ব্রাহ্মণের কাছে দাঁড়াইল এবং ব্রাহ্মণকে বলিল একটু ঘুরিয়া বসুন আমরা দুই জন ভিতরে যাইব। ব্রাহ্মণ বলিলেন

তোমরা কে ? কেন ভিতরে যাবে ? দৈত্যরা দুই জন বলিল, মহাশয় আমরা দুই জন পাহারাওয়ালা এখানে এক জনের টাকা আছে সেই টাকা ময়রা ময়রাণী তুলিয়া লইয়া খরচ করিতে না পারে তাই আমরা চৌকি দেই। প্রত্যেক রাত্রে আমরা চৌকি দিতে আসি আর সকালে প্রস্থান করি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাপ সক! আমি কন্যাভার দায়-গ্রস্থ ভিখারী ব্রাহ্মণ; আমাকে ৫০০৲ টাকা দিলে যথেষ্ট উপকার হইবে, আর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব। দৈত্যরা বলিল মহাশয় টাকা আমাদের নয়। আমরা মাত্র চৌকিদার, সুলতানপুরের হরে কলুর টাকা। আপনি যদি তার নিকট হইতে এক খানা পত্র আমাদের নামে আনিতে পারেন, তবে ৫০০ বা ৭০০ শত যাহা পত্রে লেখা থাকিবে তাহা আমরা আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন সুলতানপুর কত দূর জান কি ? দৈত্যরা বলিল মহাশয় এখান হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে সুলতানপুর, ব্রাহ্মণ শুইয়া রহিলেন, ভোরে ময়রাণীকে ডাকিয়া বলিল মা, আমি চলিলাম, ময়রাণী আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া পায়ে ধরিয়া বলিল আমার স্বামী পাগল কিছু মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন মা, তুমি লক্ষ্মীরূপিণী তোমার যত্নে ও ভক্তিতে আমি কিছুই মনে করিব না। ব্রাহ্মণ হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় বেলা ১০টার সময় সুলতানপুর গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়া হরে কলুর বাড়ী খুঁজিতে লাগিলেন, মানুষ জন সকলেই ব্রাহ্মণকে বাড়ী দেখাইয়া দিল, ব্রাহ্মণ ডাকিতে লাগিলেন হরিচরণ বাড়ী আছ কি ? হরে সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়,

আপনি কে এবং কেন আমাকে ডাকিতেছেন ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হরি আমি কন্যাভার দায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণ, আমাকে ১০০৲ টাকা দাও যাহাতে আমি জাত রক্ষা করিতে পারি। হরে হরের স্ত্রী দুই জনেই হাসিয়া ব্যাকুল। হরে বলিল, ঠাকুর আমার একটী খানি গাছ ও একটী লেজ কাটা অক্ষম গরু আছে। খেতে পাই না, ছেলে মেয়ের মাথায় তৈল দিতে পারি না, আমার থাকিবার ঘর পর্য্যন্ত নাই, আপনি কোথায় শুনিলেন যে ১০০৲ টাকা আমার কাছে পেয়ে কন্যার বিবাহ দিবেন ? আশ্চর্য্য কথা, ব্রাহ্মণ বলিলেন, হরি তোমার দুই জালা টাকা আছে আমি সন্ধান পেয়েছি, তুমি কেন ছলনা করিতেছ, তুমি দিবে স্বীকার কর। হরে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া বলিল আচ্ছা ঠাকুর আমি দিব, আপনি কোথায় শুনলেন যে আমাদের টাকা আছে ? হরি তুমি আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়া দাও, আমি তোমার দুই জালা টাকার মধ্য হইতে মাত্র ১০০৲ টাকা লইব, তুমি লিখিয়া দাও, হরে সম্মত হইল ; একটা সিমের পাতা রস করিয়া ব্রাহ্মণ একটু কাগজ দিয়া বলিলেন, হরি তুমি লেখ, হে দৈত্যরা আমার টাকার মধ্য হইতে এই ব্রাহ্মণকে ১০০ টাকা দিবে, এই পত্র খানি টাকা দিয়া জালার মধ্যেই রাখিয়া দিবে। ব্রাহ্মণ পত্র খানি লইয়া বিকালে আবার ময়রার বাড়ীতে আসিলেন, ময়রাণী বলিল বাবাঠাকুর আজ কোন রকমেই আপনাকে অপমান হইতে বাঁচাইতে পারিব না। আপনি সত্বর কিছু আহার করুন, আপনার মুখ শুকিয়ে গিয়াছে, এই বলিয়া ময়রাণী কল্যকার মত

কিছু খই মুড়কী ব্রাহ্মণকে খেতে দিল ও বলিয়া দিল, এখানে খেয়েছেন স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই পেটে পা দিয়ে খই মুড়কী বাহির করিবে, আমাকেও খুন করিবে। ব্রাহ্মণ বলিল না মা আমি কাল তাহাকে খুবই চিনিয়াছি। তখনি ময়রা উপস্থিত, ওরে তুই আজ আবার এখানে শালা, খচ্চর, চাঁড়ালের বামন, তোকে খুন করিব, ময়রাণী দৌড়ে ধরিল, এই রাত্রে বিপন্ন ব্রাহ্মণ কোথায় যাবেন, আর উনি আসিবেন না। ময়রা বলিল, ওশালা খাওয়ার লোভে রোজ এখানে আসে, তুই রোজ উহাকে খেতে দিস। ময়রাণী বলিল, তোমার ঘরে আছে কি? ঘরে কিছুই নাই আমি কোথা হইতে খেতে দিব? উনি পথ হইতে খাইয়া আসিয়াছেন, একটু শুইয়া থাকিয়া সকালেই চলিয়া যাইবেন, তুমি ঠাণ্ডা হও, চল ঘরে যাই। ব্রাহ্মণ শুইয়া আছেন, দৈত্যরা আসিল, আসিবামাত্রেই হরের পত্র খানা তাহাদের হাতে দিলেন, পত্র পাঠ করিয়া তাহারা ব্রাহ্মণকে ১০০ শত টাকা আনিয়া দিল, ব্রাহ্মণ টাকা পাইয়া মনের সুখে বসিয়া রহিলেন, রাত্র যেমন শেষ হইল, অমনি উঠিয়া ময়রাণীকে বলিলেন মা আমি চলিলাম, ময়রাণী ব্রাহ্মণের পদ ধূলি লইয়া বলিলেন বাবা কি হলো টাকা পেলেন কি? ব্রাহ্মণ বলিলেন এই দেখ মা ১০০ টাকা পাইলাম, তোমার বাড়ীর দৈত্যরা আমাকে দিয়াছে। ময়রাণী অবাক, যাহা হোক বাবা আপনার কন্যা উদ্ধার হইল। ব্রাহ্মণ ময়রাণীকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বাড়ীতে আসিলেন। কিছু দিন বাদ ময়রা এক দিন মাথায় ঝাঁকা সমেত একটী গর্ত্ত পার হইতে গিয়া পড়িয়া সেখানে

মরিয়া গেল। রাত্রে ময়রা বাড়ীতে না আসায়, পর দিন ভগবতী খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখে গর্ত্তের মধ্যে মরিয়া আছে, সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া উহার সৎকার্য্য করিল।

সুলতানপুর হরে কলুর বাড়ী খাজানার দেনায় মনিব নালিশ করিয়া তাহার জমি ও ঘানি গাছ ও এঁড়ে গরুটী বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। হরে থাকিবার যায়গা খুঁজিতে খুঁজিতে ময়রাণীর বাড়ীতে স্থান পাইল। ঐখানে থাকে আর ভিটা কুপিয়ে শাক শবজী বুনিয়া ও ভিক্ষা করিয়া খায়, এক দিন কোদাল দিয়া কোপাইতেই একটী জালার গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, দেখে টাকা বাহির হইয়া পড়িল, খুঁজিয়া দেখে দুই জালা টাকা আর সেই পত্র খানি। হরে ভাবিল, ব্রাহ্মণ কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন ? তখন হরে ঐ বাড়ীতে দালান দিয়া এবং ময়রাণীকেও একটা পাকা ঘর করিয়া আর ঐ টাকার কিছু দিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। এখন দেখ কৃপণের ধনের পরিণাম কি ?

মামলার পরিণাম।

নদীয়া জেলার অন্তবর্ত্তী এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের নাম সিংভূম, উক্ত গ্রামে অল্প সংখ্যক লোকের বাস। অনেকগুলি কৈবর্ত্ত আর কতকগুলি কায়স্থ ও কতকগুলি ব্রাহ্মণ আর এক ঘর মাত্র বৈদ্য আছে, বৈদ্য বংশটী খুব সম্ভ্রান্তশালী। তাঁহার নাম হরিসাধন সেন গুপ্ত, তাঁহার এক স্ত্রী আর দুটী পুত্র সন্তান। হরিসাধন বাবু বেশ লেখা পড়া জানিতেন, দশ জনে তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন, একে বিদ্বান তাহাতে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার সময়ে গ্রামের মধ্যে মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অন্যায় কাজ কিছু মাত্র হতে পারিত না। পরস্পরের মধ্যে কোন রূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তিনি তাহা যেরূপেই হউক মীমাংসা করিয়া দিতেন ও দুই পক্ষকে মিষ্ট কথায় বিবাদের পরিণাম বুঝাইয়া দিতেন, পরস্পারের বিবাদ ইত্যাদি মিটমাট করিয়া দিতেও তাহার কিছু কিছু অর্থ মাঝে মাঝে ব্যয়ও হইত, তাহাতে তিনি কাতর হইতেন না বা তাহাতে তিনি ক্ষতি বোধও করিতেন না, এইরূপ সজ্জন আজকাল দেখা যায় না। হরিসাধন বাবুর স্ত্রীর নাম সত্যবতী, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নেপাল, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোপাল, নেপাল গোপাল দুই ভাই প্রায় দেড় বৎসরের ছোট বড়। বাল্যকালে ভাই ভাইয়ে যেমন মিল থাকিতে হয় তাহা খুবই ছিল, হরি বাবু তাহাদের লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন,

না বলিয়া তিনি তাহাদের ইচ্ছা মত উচ্চ শিক্ষা দিতে পারিলেন না। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী তাহাই তাহারা শিখিল, যখন তাহাদের বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইল তখন তাহারা ভাই ভাই প্রায়ই ঝগড়া ও মারামারি করিতে লাগিল প্রায় দুই ভাই একত্রে শয়ন ও ভোজন করিত না; ইহাতে তাহাদের পিতামাতা অত্যন্ত অসুখী হইতে লাগিলেন। হরিসাধনবাবু পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া গ্রামে অত্যন্ত সুনাম পাইয়াছেন কিন্তু গৃহ বিবাদ যেন অতি মাত্রায় প্রবল হইতেছে তাহা নিজে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। নেপালের বয়স যখন ২০ কুড়ি পার হইল তখন হরিবাবু নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে উহার বিবাহ দিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর বয়স তখন ১৩ বৎসর, বধূমাতা দেখিতে খুবই সুন্দরী, কাজে কর্ম্মে খুবই তৎপরা, শ্বশুর শাশুরীর বিশেষ বাধ্য, কিন্তু অতিশয় চঞ্চলা।

গোপালের বয়সও বর্ত্তমানে ২০ বৎসরের মধ্যে হরিসাধন বাবু গোপালেরও বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন, গোপাল ছেলেটী নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু ভাই ভাই একত্র হইলেই যেন তাহাদের ঝগড়া বিবাদ, সামনে আসিয়া দুই ভাইকে উত্তেজনা করিয়া দেয়। গোপালের ১২ বৎসর বয়সের এক সুকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হইল। হরিসাধনবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যাহাতে কন্যা চঞ্চলা না হয়, ভগবানের কৃপায় গোপালের স্ত্রী চঞ্চলা নয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত পরশ্রী-কাতরা, তাহার দুটী চোক যেন পরের উন্নতিতে অশ্রুপাত করিত। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর নাম অমলাবালা, কনিষ্ঠ পুত্রবধূর নাম চঞ্চলা, দুই বধূকে দেখিতে অতি সুশ্রী, ভাগ্যবানের

ঘরে যেরূপ বধূ হওয়া উচিত তাহাই ঠিক হইয়াছে কিন্তু বেশী দুঃখ এই দুই বধূতেও ক্ষণকালের জন্য সদ্ভাব নাই, পরস্পর পরস্পরের দিকে একবারও সুচক্ষে তাকায় না। পুত্রদ্বয়ও ঠিক ঐরূপ, হরিবাবু ও সত্যবতী নিয়ত এই ব্যাপার দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ অশান্তি আগুণে জ্বলিতে লাগিলেন। প্রতিবাসীরাও এই ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন ও কত কি বলিতে লাগিলেন। হরিসাধনবাবু বুঝিলেন যে আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে পুত্রদের সমস্ত বিষয়াদি তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইব, যদি বিষয় বণ্টন হইয়া থাকিল তবে আমার অভাবে বিবাদের কোন চিহ্ন থাকিবে না, বিষয়ই বিবাদের মূল কারণ। সত্যবতীও ইহাতে মত দিলেন এবং এই যুক্তিই সার যুক্তি। হরিবাবু পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দুই ভাই পরস্পরই সমান, এবং দুই বধূও তোমাদের দুয়েরই সমান, তোমরা পরস্পর একত্র থাকিলে ভবিষ্যৎ বিবাদ অনিবার্য্য। আমি ও তোমাদের জননী পরামর্শ করিয়াছি যে বিষয় ও নগদ টাকাকড়ি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া তোমাদের শান্তিতে রাখিয়া যাইব। আগামী কল্য লিখিতপড়িতের দ্বারা সমস্ত ভাগ করিয়া দিব। তোমরা প্রস্তুত থাকিয়া ভাগ ইচ্ছা মত গ্রহণ করিও, দুই ভাই তাহাতে সম্মত হইল ও দুই বধূ ইহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। হরিসাধনবাবু ঠিক তুল্যরূপে সমস্ত বিষয় ও নগদ টাকা ভাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশ চিহ্নিত করিয়া দিলেন। দুই ভাই বিনা গোলে ও আপত্য শূন্য হইয়া ভাগ গ্রহণ করিল।

আজ কাল দুই ভাই ও দুই স্ত্রী বেশ সুখ শান্তিতে আছে। ঘাটের পথের জমি দুইজনের সমানভাবে রহিল কারণ দুইজনের ঘাটে যাওয়া আসার রাস্তা, এই জন্য এই জমি উভয়ের সমান সমান অংশ রহিল। ঐ জমির মধ্যে একটী তাল গাছ ছিল, সে সময় ঐ তাল গাছের দাম ১৲ টাকা মাত্র, হরিবাবু ঐ তাল গাছটীর বিষয় কাগজ পত্রে কিছু লিখিয়া দেন নাই কারণ সামান্য তাল গাছ তার মূল্য এক টাকার কম হইবে ছাড়া বেশী হইবে না অর্থাৎ উহা এত সামান্য বিষয় যে তাহা হরিবাবু উল্লেখও করেন নাই। হরিসাধনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সত্যবতী পুত্রদের ও বধূদের শান্তি দেখিয়া খুব সুখী হইয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া উহারা কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের ও মা অন্নপূর্ণার সন্নিধানে বাস করিবার মতলবে বাটী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সংসারের সাধ মিটাইয়া এখন কাশীবাসী হইলেন। নেপালের দুই পুত্র ও এক কন্যা আর গোপালের দুই কন্যা ও এক পুত্র, পরস্পর কেহ কাহারও মুখ দেখাদেখি নাই। বিষয় আশয় পৃথক পৃথক; দুই ভাই আদায় তহশীল করে, মালেকের রাজকর দেয় আর বক্রী টাকা সংসারে খরচ করে, দুই ভাই কোন চাকরী করে না, তবে জমি যায়গা আছে খাটিয়া খুটিয়া তাহাতে যাহা আয় হয় তাহাই জমায়, যে যেমন খাটে তার তেমি জমে। ঘাটের পথের তাল গাছের দিকে মনে মনে সকলেরই লক্ষ্য, নেপাল ভাবিতেছে তাল গাছ আমাদের, গোপাল ভাবিতেছে তাল গাছ আমাদের, চঞ্চল স্বভাবা অমলাবালা ভাবিতেছে তাল

গাছ আমাদের, আর পরশ্রীকাতরা চঞ্চলা ভাবিতেছে যে তাল গাছ আমাদের ছাড়া আর কার। এক দিন ঝড়ে ঐ তাল গাছের একটী শুকনা পাতা পড়িয়াছে ঐ পাতা ছোট বউ আনিয়াছে, ইহা দেখিয়া বড় বউ বলিল, ঐ গাছ তোর নয় উহা আমাদের গাছ; পাতা ফিরিয়ে দে, ছোট বউ বলিল গাছ আমাদের, তোদের নয়, পাতা কোন রকমে পাইবে না। নেপাল, গোপাল তখন বিষয় কর্ম্মের জন্য বাহিরে গিয়াছিল, বাড়ীতে ছিল না, তাল গাছের পাতা লইয়া দুই বউতে ভয়ানক ঝগড়া উপস্থিত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে নেপাল, গোপাল বাড়ী আসিয়া দুই বউদের নিকট দুই ভাই শুনিয়া সমস্ত রাত ঐ গাছ তোমার নয় আমার এই বলিয়া ঝগড়া করিয়া রাত কাটাইল, আগামী কল্য দুই ভাই গ্রামের বিবাদ মীমাংসাকারী দেখিয়া ৩।৪ জন লোক ডাকিল, তাঁহারা বলিলেন যে তোমাদের বাবা যখন গাছের কথা উল্লেখ করেন নাই, আর গাছস্থিত জমি যখন তোমাদের উভয়ের তুল্যাংশে আছে তখন ঐ গাছও উভয়ের হওয়া উচিত; এ ছাড়া আর ইহার কিছু সূক্ষ্ম দেখিতে পাই না। দুই চারি জন লোক ছাড়া অনেক লোকই যাহাতে বিবাদ প্রজ্জ্বলিত হয় ঐ গ্রামে সেই সব লোক বিস্তর ছিল, পরস্পর দুই ভাইদের নিকট যাইতে লাগিল তাহারা পাড়াগাঁয়ের যেরূপ স্বভাব সেই স্বভাবানুযায়ী কথা কহিয়া দুই ভাইকে এক টাকা মূল্যের তাল গাছের জন্য মামলা বাঁধাইয়া দিল, দুই ভাই ও দুই বউ একেবারেই মামলায় উন্মত্ত হইয়া গেল, কথা এই, সকলেই বলে তাল গাছ আমাদের; ক্রমেই এই

মামলা হইতে বিবিধ মামলা প্রসব হইতে লাগিল। গ্রামের মামলাবাজেরা দুই পক্ষ হইয়া দুই দিকে দাঁড়াইল এক এক পক্ষে ২০।২২ জন করিয়া সাক্ষী। ঘোর মামলা, অবিরাম মামলা, মামলাই স্ত্রী পুরুষের বোল, জীবন থাকিতে মামলা মিটিবে না, আমি নিশ্চয়ই তাল গাছ পাইব ; জীবন যাউক তাল গাছি চাই, দুই ভাই বাড়ীর বারেন্দায় বেড়া দিয়া ঘিরিল কেহ কাহারও মুখ দর্শন করিবে না। মামলার আগুণ বৈশাখের রৌদ্রের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া যান, সম্ভ্রম অর্থ ইত্যাদি জ্বালাইয়া ক্রমে ক্রমে শেষ করিতেছে, ইহারা আত্মীয় স্বজন কাহাকেও ডাকিতেছে না, কেহ যদি মিটমাটের জন্য আসেন তবে নেপাল গোপাল বলে যে তাল গাছ ছাড়া যাহা বলিবেন তাহাই শুনিব, যদি বউদের পিতারা আসিয়া বউদের কাছে গিয়া বলেন বাপু একটি কথা বলিব শুনিবে ? বউমারা বলেন তাল গাছ ছাড়া যাহা হয় বলিতে পারেন। দুই ভাই গ্রামের লোক জন লইয়া ক্রমাগত মামলা চালাইতে লাগিল, এদিকে যেমন টাকার অভাব হয়, অমনি জমি যায়গা বন্ধক রাখিতে লাগিল এক একটী বিষয় তিন বার পর্য্যন্ত বন্ধক হইল। স্ত্রীদের গহনা, বালক বালিকার হাত ও গলার গহনা প্রথমতঃ বন্ধক, পরে একেবারেই বিক্রয়। যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে এ আগুণ কি সহজে নির্ব্বাণ হইবে ? এ আগুণ নিভাইতে পারে এমন আত্মীয় ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে যখন দুই ভায়ের অবস্থা একেবারে শেষ, তখন উহাদের গুরুদেব শ্রীযুক্ত রাম জীবন গোস্বামী মহাশয় শুনিলেন যে হরিসাধনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী কাশীবাসী

হওয়ার পর হইতে তাঁহার দুই পুত্র সামান্য একটা তাল গাছ লইয়া বিবাদ করিতে করিতে একেবারেই উৎসন্ন হইতেছে। এক বৎসর ধরিয়া শত শত মামলা হইতেছে, এখনও তাহাদের মামলার নেশা ছুটে নাই। রাম জীবন গোস্বামী অতিশয় সাধু ও জনপ্রিয় এবং দয়ালু তাঁহার শিষ্যরা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায় বুঝিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল তিনি আর বিলম্ব না করিয়া পর দিন প্রাতে শিষ্য বাটীতে আসিলেন, এবং তাঁহাদের বাটীর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় রোদন করিয়া ফেলিলেন, প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ নেপালের নিকট গেলেন, নেপাল যত্ন করিয়া বসাইয়া পদধূলি লইয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, পরে গুরুদেবের পাকশাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিল, গুরুদেব পাক করিয়া আহার করিতে বসিবার সময় বলিলেন বাপু নেপাল আমি তোমাকে একটী কথা বলিব, তুমি কথাটা শুনিবে ত ? নেপাল বলিল গুরুঠাকুর তাল গাছ ছাড়া যাহা বলিবেন তাহা শুনিব। পরে নেপালের স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল মা, আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরু, তোমরা নষ্ট হইলে আমার যত কষ্ট হইবে এত আর কাহারও হইবে না আমার অনুরোধ মামলাটী মিটাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাও, জ্যেষ্ঠা বধূ বলিল, তাল গাছ থাকিতে মামলা মিটিবে না, সবই গিয়াছে, আর যাহা আছে তাহাও যাউক কিন্তু তাল গাছ পাওয়া চাইই চাই। গুরুদেব আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করতঃ বিকালে গোপালের নিকট গেলেন, গোপালও গুরুঠাকুর মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া কুশলাদি

জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুরের মনোরঞ্জন করিল। গোপাল বলিল গুরুঠাকুর অদ্য রাত্রে আমরা বাটীতে থাকিব না, আমাদের তাল গাছের মামলার দিন আগামী কল্য, আমরা সকলেই সন্ধ্যার সময় শকটে আরোহণ করিয়া বাটী হইতে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইব। আমার নিবেদন, আপনি একটু বেলা থাকিতে পাকশাক করিয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করুন। গুরুদেব বলিলেন, বাপু, আমার একটা কথা শুনিবে? গোপাল বলিল গুরুদেব তাল গাছের মামলা মীমাংসা করা কথা বলিলে মান থাকিবে না, ঐ কথা ছাড়া যদি কিছু বলেন তাহা শুনিতে পারি। গুরুদেব দেখিলেন ইহাদের উভয়কেই রাহুতে গ্রাস করিয়াছে, আর ত রক্ষা নাই, তখন গুরুঠাকুর পাকশাক করিয়া আহার করিতে রাজী হইলেন, ত্বরায় গোপাল পাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোক জন সব ডাকাডাকি করিতে লাগিল কারণ রাত্রে ৮টায় না গেলে ভোরে উকিলের বাসায় যাওয়া যাইবে না। গুরুদেব আহার করিয়া স্থির হইয়া শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ইহাদের বাঁচাইবার উপায় কি? খানিক পরে মতলব করিলেন যে উহারা কেহই বাড়ীতে নাই, আমি আজই এই তাল গাছ কাটিয়া লইয়া বাড়ীতে যাই, গাছ গেলেই বোধ হয় এখন ইহারা কষ্টে সৃষ্টে দরিদ্রভাবে পরিবারাদি লইয়া শেষ জীবন কাটাইতে পারিবে, এই স্থির করিয়া ঢাকুইদার অর্থাৎ যাহারা গাছ কাটিতে পারে তাহাদের আনিয়া গাছের গোড়া কাটিয়া তাঁহার বাটীর ঘরের আসবাব পত্র প্রস্তুত করিয়া বেলা ২টার মধ্যে সমস্ত কাট ইত্যাদি লইয়া বাটীতে যাত্রা

করিলেন। দুই ভায়ের পক্ষের লোকেরা আদালতে গিয়া সংবাদ দিল গুরুঠাকুর সে বিবাদী তাল গাছ কাটিয়া লইয়া বেলা ২টার সময় বাটীতে গিয়াছেন। দুই ভাই শুনিয়া তখনি কাঁদিতে লাগিল পরে মোকর্দ্দমার সময় লইয়া পক্ষগণকে লইয়া বাটী আসিল। দুই স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীদের নিকট আসিয়া গুরুঠাকুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। দুই ভাই উন্মত্ত হইয়া কেউ বলে আমার তাল গাছ, কেউ বলে তাল গাছ আমার, প্রায় বাতুলের মত চীৎকার করিয়া প্রতিবেশীদিগকে কত কি বলিতে লাগিল, ছোট ভাই একবার তাল গাছের গোড়ায় যায়, বড় ভাই একবার কাটা তাল গাছের গোড়ায় যায়। দুই এক দিন এইভাবে কাটিল, মামলার আগুণ এখন একদম নিভিয়া গেল, এখন ঋণের ভাবনা আসিয়া পড়িল, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের ভরণ পোষণের অভাব হইল। নুন আনতে তেল থাকে না, তেল আনতে লঙ্কা থাকে না; দুই ভায়ের দশা এইরূপ হইল, ক্রমে পাওনাদারগণ বাটীতে আসিয়া তাগিদ করিতে লাগিল। কোনই উত্তর নাই, পাওনাদারগণ কড়া কথাও বলিতে আরম্ভ করিল, কড়া কথায় কি হইবে? ক্ষমতা না থাকিলে কড়া কথায় কি টাকা আদায় হয়? টাকার শোকে আর অনাহারের যন্ত্রণায় এবং স্ত্রী পুত্র কন্যার ক্রন্দনে নেপাল ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া গেল, গোপাল আর কোন উপায় না দেখিয়া শ্বশুর বাটীতে স্ত্রী ও কন্যাদের রাখিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল আজও তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া গেল না। হায় মামলা! তোমার কি সর্ব্বস্বান্ত ক্ষমতা, মামলা

ও ডাক্তার যাহার ঘরে ঢুকিবে তাহার আর কোন রকমে পরিত্রাণ থাকিবে না। প্রায়ই দেখা যায় আয়ু থাকিতে মামলাবাজ লোকেরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পশ্চিমের লোকের গালাগালি এই, তোর ঘরে মামলা ও ডাক্তার ঢুকুক।

উন্নতির চরম।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার এক বন্ধু বাস করেন, তাঁহার যৌবনের প্রথম হইতে আমার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে, তিনি যথার্থ গরীবের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, মুখুয্যে বংশসম্ভূত। ইঁহার উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, বদনমণ্ডল শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও শান্তিপ্রদ। তাঁহাকে যেন করুণাময় পরমেশ্বর শান্তির আধার করিয়া এই ধরাভূমে জগতের কোন অভাব মোচনের জন্য পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অসীম তেজপূর্ণ ও নির্ভীকচিত্ত, মুখ দেখিলে কিন্তু সেরূপ বোধ হয় না; ইনি বিদ্বানও বটে, কিন্তু কলিকাতায় কোন এক আপিসে ৪০৲ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন। পরিবারের মধ্যে মাতা, তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী স্ত্রী। বন্ধুর বয়স ২৫ বৎসর মাত্র, পৈতৃক একখানি একতলা ৪।৫টি ঘর সমেত নিজের বাটী আছে, কোন ভাড়া দিতে হইত না, অথবা কোনও ভাড়াটিয়া সে বাটীতে স্থান পাইত। বন্ধু অতি সম্মানী বংশের সন্তান। ইনি যে আপিসে চাকরী করিতেন সেই আপিসের উপরওয়ালার সঙ্গে ইঁহার প্রায়ই বাক্‌বিতণ্ডা হইত, অর্থাৎ বিদ্বান লোক মাত্রেরই সহিত উপরওয়ালার ঝগড়া হইত, ক্রমে ক্রমে অনেক পণ্ডিত লোক উপরওয়ালা মহাশয়ের নিকট অপমানিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু আমার বন্ধুও একদিন অপমান হইয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার মনের ধারণা হইল যে চাকরী

ত্যাগ করিবেন, অথবা অন্য বিভাগে যাওয়ার সুবিধা পাইলেই যাইবেন। মণিব অযথা তিরস্কার করিলে চাকরের মনে বিশেষ কষ্ট হয়, কিন্তু দু'এক দিন পরে উদরান্নের তাড়নায় কষ্টও দূর হইয়া যায়, কিন্তু আমার বন্ধুর মনে সে দিনের অপমানের কথা জাগরুক আছে, তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না। পুনরায় দুই সপ্তাহ পরে বন্ধুকে উপরওয়ালা মহাশয় কাগজ পত্রের ভুল ধরিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন, পরে কাগজপত্র লইয়া যখন বন্ধু নিজে দেখাইলেন, তখন ভুল নয়, বৃথা তিরস্কৃত হইয়াছেন, উপরওয়ালা মহাশয় ইহা দেখিয়াও তাঁহার নিজের দোষ স্বীকার না করিয়াও তিরস্কারের জের টানিতে লাগিলেন।

বন্ধু তখন বুঝিলেন, যে চণ্ডালের পাখীতে রাধাকৃষ্ণ বলে না। উপরওয়ালা মহাশয় বুঝিলেন, আমার উপর আর উপরওয়ালা নাই। বন্ধু চাকরী ত্যাগ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাটিতে আসিলেন, আজ শরতের চন্দ্র, অমানিশার ন্যায় ঘোর অন্ধকার, শরীরে শক্তি নাই, মনে বল নাই, অন্তরে সে অসীম তেজ নাই, যেন নিজেকে নিজে বহন করিতে ব্যথিত, বদন বিষণ্ণ, নয়ন যুগল অর্দ্ধনিমীলিত পলাশ ফুল তুল্য, ইহা দেখিয়া সন্তান সুখে সুখীনি ও সন্তান দুঃখে দুঃখিনী, স্নেহের মন্দাকিনী জননীদেবী আসিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া পুত্রের শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার উত্তর করিলেন, দেবী চাকরী নাই, আমি আজ অভাগা, পরমুহূর্ত্তেই জ্যেষ্ঠা সহোদরা গিরিনদী প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, ক্ষণপরে হেমবরণী হেমাঙ্গিনী আসিয়া জীবিতনাথের বিধুবদন সুধাহীন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন কি হইয়াছে?

তোমায় কোন্ দুঃখে কাতর করিয়াছে? হা হতভাগিনীর স্বামিন্! সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? এই সময়েই বর্ষা বারির ন্যায় সকলেরই নয়ন যুগল জলপ্লাবিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এই পরিবারের এই দৃশ্য দেখিয়া কাহার মনে বিষাদের সঞ্চার না হয়? আর কার মনেই বা চাকরী আনন্দের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়? হা চাকরী! তোমার অপেক্ষা কি কুকুর সুখী নয়? এই সংসার চিত্রখানির যদি তখন ফটো তোলা হইত তবে পাঠক ও পাঠিকাগণ সেই ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন যে পরাধীন জীবনের কত সুখ? যুবক বন্ধু তখন মাতা, দিদি ও স্ত্রী সকলকেই বলিলেন এখন সংসারে সকলকে খাটিয়া খাইতে হইবে, আমার একার দ্বারা সকলের অভাব অবশ্য মোচন হইবে না। এক বাক্যে সকলেই বলিলেন তোমার কোন চিন্তা নাই আমরা সকলেই খাটিতে সক্ষম তুমি আমাদের কাজ দাও। পর দিন সকালে বন্ধু একটী চাকর অনুসন্ধান করিয়া আনিলেন। চাকরটীর নাম যুগল, তাহাকে সঙ্গে করিয়া চারিদিকে পল্লীতে বিকালে বাহির হইলেন, এবং থোর, মোচা, কাঁচকলা, পাকা কলা, জাম ও জামরুল ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্য নগদ পয়সা দিয়া খরিদ করিয়া উভয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। পর দিন সকালে বন্ধুর বাটীর অনতিদূরে একটী বাজারে ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া বন্ধু নিজে মাটীতে বসিয়া গামছা কাঁধে দিয়া বিক্রয় করিতে বসিলেন, যুগলকে বলিলেন তুমি ঐ সকল পল্লীর নিকটস্থ ময়দান হইতে চুপড়ী লইয়া গোবর কুড়াইয়া লইয়া আইস, যুগল তখনি চুপড়ী হাতে করিয়া গোবর

কুড়াইয়া আনিতে চলিল, ক্রমাগত ১২টার মধ্যে ১০.১২ চুপড়ী গোবর আনিয়া ফেলিল। বন্ধু বাজার হইতে জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া ঐ সময় বাটীতে আসিলেন, এবং মাতা, দিদি ও স্ত্রী ইহাদিগকে বলিলেন তোমরা বাটীতে বসিয়া গোবরের ঘুটে দাও, এই বলিয়া যুগলকে সঙ্গে লইয়া বিকালে আবার ফল মূল ক্রয় করিতে পল্লীতে গেলেন, সে দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় দ্রব্যাদি সমস্ত খরিদ করিয়া লইয়া আসিলেন। যখন রাত ৭টা তখন বাটী আসিয়া দেখিলেন যে স্ত্রী ও দিদি এবং মা ঠাকুরাণী সকলেই ঘুটে দিয়া বাটীর ভিতরের একধারের পাচিল ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। পাচিল ভর্ত্তি ঘুটে দেখিয়া বন্ধুর অতিশয় আনন্দ হইল। আজ কাল অনেক লোকে গৃহকর্ম্মকে ঘৃণ্য কাজ মনে করেন, কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহকর্ম্ম এত ঘৃণ্য ছিল না। পাচিল ভরা ঘুটে, দাওয়া ভরা তরকারী, হাওয়া ভরা ময়দানের কাছে বাড়ী, আর মন ভরা আনন্দ, ইহাতে পরিবারের মনে কি আনন্দ হইল তাহা কি সকলে বুঝিতে পারেন? যিনি স্বাধীন তিনিই ইহা বুঝিতে পারেন। পর দিন প্রাতেই যুগল তরকারীর বাজরাগুলি বাজারে পঁহুছাইয়া দিয়া, সকাল সকাল গোবর আনিতে চলিল, চাকরটীর অন্তরে কেমন এক অতীব আনন্দ হইতেছে, চাকর উৎসাহের সহিত গোবর কুড়াইয়া আনিতে লাগিল আর গৃহিণীরা অতি তৎপরা হইয়া ঘুটে দিতে আরম্ভ করিলেন, বাজারে বন্ধুর দোকানে তরকারী পাইতে আর কারুর দোকানে কেহ কিছু ক্রয় করে না, আহা! সেই দেবতুল্য দেহ ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে, গামছা কাঁধে রোদে গাত্রের ঘামে

শরীর হইতে সর্ব্ব গ্লানি বাহির হইয়া যাইতেছে, মনের উৎসাহে কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে শ্রীভগবানকে ডাকিয়া তরকারী বিক্রয় করিতেছেন। যুবক বাটীতে আসিয়া দেখেন যে গত কল্য অপেক্ষা অদ্য অনেক গোবর সংগ্রহ করিয়া যুগল এখনও গোবর আনিতেছে, প্রায় বেলা ১টার সময় যুগল বাটীতে আসিয়া স্নান আহার করিল, যুগলের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল যেন যুগলও এই পরিবারের ব্যথায় ব্যথিত।

অনেক আফিসের উপরওয়ালার চেয়ে অনেক বাড়ীর চাকরের প্রাণ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আজ তিন দিন হইল কাজের সবই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহার যে কাজ করিতে হইবে তিনি তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন, যুগল যুগলের কাজ করে, মাতাঠাকুরাণী তাঁহার যে কাজ তিনি তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন, দিদির কাজ দিদি বুঝিয়া করিতেছেন, হেমাঙ্গিনীও তাঁহার কাজ পরিষ্কার ভাবে করিতেছেন, বন্ধু তাঁহার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন, ক্রমাগত কাজ চলিতে লাগিল, কাজ করিতে কেহ কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না, যেন স্বভাবের গতিতে কর্ম্ম চলিতে লাগিল, এইরূপ আলস্যশূন্য না হইলে আর এইরূপ সৎপথে থাকিয়া খাটিয়া না খাইলে কি উন্নতির পথে পদার্পণ করা যায়? অনেকে না খাটিয়া পরকে ঠকাইয়া, পরকে কাঁদাইয়া, পরের গলায় ছুরি বসাইয়া, পরস্ব অপহরণ করিয়া উন্নতি করিতে চাহেন, তাদের উন্নতি যমের বাটীতে গিয়া হইয়া থাকে, এইরূপ লোকের মরণ প্রায়ই জেলখানায়, আর প্রায়ই আঁধারের গলির ড্রেনের ভিতর হইয়া থাকে, আর চরম উন্নতি মল্লিক

বাটীতে অতিথি এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভিক্ষা। এইরূপ সৎপথে থাকিয়া খাটিয়া খুটিয়া এক মাস পরে হিসাব করিয়া দেখিলেন যে সংসারের সকল খরচা নির্ব্বাহ হইয়া এবং যুগলের বেতন পর্য্যন্ত শেষ হইয়া ২৩৲ তেইশ টাকা লাভ হইয়াছে, ৪০৲ টাকা বেতনে চাকরী করিয়া প্রতি মাসে ২।৩৲ টাকা ধার হইত। পর মাসে আর একটী নূতন চাকর নিযুক্ত করিলেন তাহার নাম খগেন, যুগলের নিকট সে সব শিখিয়া বুঝিয়া লইল, খগেন বন্ধুর সঙ্গে তরকারী আনিতে যায়, যুগল ঐ সময় মেয়েদের সঙ্গে ঘুটে দিয়া তাঁহাদের অনেক সাহায্য করে। যুগল সকাল হইতে চারিদিকের ময়দান হইতে অনবরত গোবর কুড়াইয়া আনিতে লাগিল, এই মাসে কাজ অতি দ্রুত চলিতে লাগিল, মনের উৎসাহে সকলেই পরিশ্রমকে তুচ্ছ করিয়া খাটিতে লাগিলেন। মাস শেষ হইলে হিসাব করিয়া দেখিলেন এই মাসে সব খরচা সম্পন্ন হইয়া ৮০ আশি টাকা লাভ হইয়াছে। তৃতীয় মাসে আর একটী চাকর নিযুক্ত করিলেন, তাহার নাম তিনু. তিনুও বেশ ছোকরা, তিনু ও যুগল দুই জন গোবর কুড়ায় আর সকলে একত্রে ঘুটে দেয়, এবং চাকরেরা বাজারে বিকালে ঘুটেও বিক্রয় করিয়া আসে, তিন মাস শেষ হইলে হিসাব করিয়া দেখিলেন এই মাসে ১৪৫৲ টাকা লাভ হইয়াছে।

চতুর্থ মাসে একখানি গরুর গাড়ি করিলেন, পল্লী হইতে গোবর গাড়ীতে আনিতে লাগিল, মাতাঠাকুরাণীকে কাজ হইতে সরাইয়া দিয়া এখন দিদি ও হেমাঙ্গিনী আর যুগল ও তিনু চারি জন ঘুটে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকিলেন।

খগেন, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর কাজেই আছে, সকালে কেহ কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, যাঁহার যে কাজ তাঁহা তিনি ঠিক ভাবেই করিতেছেন, ইহার নামই উন্নতি। এক বৎসর পরে হিসাবে বন্ধু দেখিলেন যে ১৩০০ টাকা হাতে জমা হইয়াছে। কাজ চলিতে লাগিল, কাজ অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল, কাজের জন্য চাকরগুলি যেন আপনার কাজ মনে করিয়া কাজ করিতে পাগল হইয়াছে, এইরূপ আড়াই বৎসর পরে বন্ধু ঐ বাজারে একখানি মুদির দোকান করিলেন তরকারীর কাজ খগেন নীচে বসিয়া করিতে লাগিল, বন্ধু দোকানদারী করিতে লাগিলেন, ৪ চারি বৎসর পরে হিসাব করিয়া দেখেন যে প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার বেশী হাতে জমিয়াছে। ঐ বাজারের উত্তরে একটী পুরাতন পাটের কল ছিল সেই কলের পূর্ব্ব পার্শ্বে কোন এক সাধারণ লোকের ৬১ বিঘা জমি পতিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে বর্ষা কালে জল উঠিয়া প্লাবিত করিয়া ফেলিত ফসল কিছুমাত্র জন্মিত না, সেই লোকটী ঐ ৬১ বিঘা জমি বিক্রয় করিবার প্রার্থী হইলে আমার বন্ধু উক্ত ৬১ বিঘা জমি ১১০০ টাকা দিয়া খরিদ করিয়া লইলেন। জমি পড়িয়া রহিল; পাড়াগাঁয়ে সাধারণের বাহে যাওয়া গরু মহিষ ইত্যাদি চরিবার স্থান হইল, বন্ধু তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া নিজের কাজে নিজে মত্ত থাকিলেন। বন্ধুর এত সুন্দর সময় আসিয়াছে যে যাহাতে হাত দিতেছেন তাহাতেই অর্থ অজস্র আসিতেছে। জমি খরিদের দুই বৎসর পরে পুরাতন পাটের কলের পার্শ্বে আর একটী পাটের কল হওয়া একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের জমি অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার বন্ধুর ঐ জমি তাঁহাদের পাটের কল হইবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল, কর্তৃপক্ষেরা আসিয়া বন্ধুর নিকট সন্ধান লইলেন, যে ঐ জমি তাঁহাদের দরকার মত কতক অংশ পাইতে পারেন কিনা, বন্ধু বলিলেন আমি আপনাদের দরকার মত স্থান বিক্রয় করিতে পারি। কর্তৃপক্ষেরা চল্লিশ বিঘা খরিদ করিবার অভিপ্রায়ে ৬৩ তেষট্টি হাজার টাকা মূল্য নিরুপণে তিন হাজার টাকা বায়না দিয়া জমি খরিদ স্থির করিয়া গেলেন, দশ দিনের মধ্যে দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া ২১ বিঘা বাদে ৪০ বিঘা তাঁহারা চিহ্নিত করিয়া লইলেন। বন্ধু ঐ ৬৩ হাজার টাকার মধ্য হইতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া প্রায় হাজার বিঘা বিল জমি খরিদ করিলেন, বিল জমিতে বর্ষাকালে কই, মাগুর, সিঙ্গী প্রভৃতি মাছের আমদানি হয় ঐ মাছ শীতের শেষে যখন জল কমিতে থাকে, তখন ধৃত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয় বন্ধুর বার্ষিক প্রায় ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা মাছ বিক্রয়ের আয় হইতে লাগিল। অধিকাংশ জমিতে ধান হইতে লাগিল, বার্ষিক ৩০০ হইতে ৪০০ টাকার ধান হইতে লাগিল, এখন বন্ধুর গোলাবাড়ী ধানের জমির চাকর ইত্যাদি বিস্তর লোক জন হইয়া পড়িল, বন্ধুর কাজ ক্রমাগত চলিতে লাগিল। বন্ধুর যে ২১ বিঘা জমি কলের পাশে পড়িয়া আছে তাহাতে সুন্দর একটী ছোট বাগান প্রস্তুত হইল সেই বাগানে ফলও বার্ষিক ৪০০।৪৫০ টাকা বিক্রয় হইতে লাগিল। বন্ধু ঐ বাজারে একটী আড়ৎ করিলেন, যে স্থান হইতে যত ফসল বিক্রয় হইতে আসিবে সে সমুদয় বন্ধু খরিদ করিতে লাগিলেন

এবং গুদাম ভর্ত্তি করিয়া সুন্দর ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিতে লাগিলেন। বর্ষার সময় ঐ সকল দ্রব্য দেড় গুণ দুই গুণ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল, আবার বর্ষার সময় যে দ্রব্য আমদানি হইতে লাগিল তাহাও খরিদ করিয়া গুদাম ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন, শীত কালে তাহা দ্বিগুণ আড়াই গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এখন বন্ধুর চতুর্দ্দিক হইতে সম্মানের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, বন্ধু ধনী, মানী, কুলীন, পরহিতৈষী, স্বনামধন্য পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এখন একটী ছোট খাটো জমিদার হইয়াছেন। ৩৬ খানি মোটর চলিতেছে, প্রতিদিন তাঁহার আয় ৪০০৲ টাকার অধিক। আমার বন্ধুর এখনও সেই সাধারণ একখানি কাপড় পরা ও সামান্য একটা জামা গায়ে দেওয়া অবস্থা কিন্তু পরের দুঃখ ক্লেশ নিবারণ তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। দেখ সৎপথে থাকিয়া ভগবানকে ডাকিলে কোথায় উন্নতির ব্যাঘাত হয়?

গণককারের গণনা।

গত তিন বৎসর পূর্ব্বে লেখক পাটের ব্যবসায় গিয়াছিলেন, ব্যবসা বুদ্ধি না থাকা হেতু তিনি কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিষয় বুদ্ধি না থাকিলে যেমন বিষয় রক্ষা হয় না, তদ্রূপ ব্যবসা বুদ্ধি না থাকিলে ব্যবসাও রক্ষা হয় না। অর্থ নষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইলে কোন প্রকারেই উহা রক্ষা করা যায় না, কারণ অর্থ অতি চঞ্চল বস্তু, উহা এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না, তজ্জন্য দেখা যায়, আজ যিনি রাজা আগামী কল্য আবার তিনিই ভিখারী, অর্থে ভিখারীকে রাজা করে, আর রাজাকে ভিখারী করে, অতএব অর্থ থাকিতে থাকিতে সৎকর্ম্ম করাই ভাল। লেখক সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়া যখন বাটীতে এলেন তখন প্রায়ই দিবানিশি বসিয়া বসিয়া অসুখ ভোগ করিতেন, বসিবার প্রধান স্থান কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ভারত দ্রব্য ভাণ্ডার, ঐ ভাণ্ডারে অদ্যাপিও নিষ্কর্ম্মা লোকদের বসিবার একটী আড্ডা আছে, ভারত দ্রব্য ভাণ্ডারের ম্যানেজার ফণীবাবু অতি ভদ্র ও উচ্চ বংশের সন্তান। তাঁহার কাছে যিনি যেভাবে যাউন না কেন তিনি সদ্ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করিতেন, এবং সকলের বেদনায় বেদনা অনুভব করিতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা সহাস্য, অন্তঃকরণ অতি পবিত্র কলিকালের লোক ঐরূপ হওয়া খুবই অসম্ভব। লেখক প্রায়ই ; ফণীবাবুর নিকটে গিয়া মনের সুখে বসিতেন, ফণীবাবুর উপদেশে অর্থ নষ্টজনিত মানসিক বিষাদ দূর করিতেন, আরও কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইত কিন্তু ফণীবাবুর

উপদেশে তাহাও রক্ষা হয়, এই কারণে ফণীবাবুর উপর লেখকের আজ পর্য্যন্তও বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। লেখক কখনও গণককারদের বিশ্বাস করিতেন না, গণককার যে বিপন্ন লোকদিগকে গণিয়া ফাঁকি দিয়া টাকা লয় ইহা লেখক খুবই বুঝিতেন, কিন্তু ফণীবাবু এক দিন বলিলেন, মহাশয় একটী অন্ধ গণককার আছেন, তাঁহার গণনা অতি চমৎকার তিনি নিকটেই থাকেন ২০।২৫ মিনিটের পথ, এখান হইতে উত্তর দিক, আপনি একবার তাঁহার কাছে গিয়া হাত দেখাইয়া আসুন, আমি পণ্ডিত মহাশয় ও অন্যান্য দুয়েক জন জ্ঞানবান মহাত্মাদের নিকট ঐ গণককারের ভূয় ভূয় প্রশংসা শুনিয়াছি।

লেখক বলিলেন, আপনার কথা অনুসারে আমি এক টাকা নষ্ট করিতে চলিলাম, কারণ ফণীবাবুর অনুরোধে এক টাকা নষ্ট হইলেও তাহাতে কেহই কষ্ট অনুভব করেন না। সেই দিন শুক্রবার ঐ ভাণ্ডার হইতে তখনি যাত্রা করিলাম, ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে ফণীবাবুর কথিত সেই গণককার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম তথায় কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকজন বসিয়া আছে, তাহারা ঐ পাড়ারই লোক। যখন আমি গণককার মহাশয়ের বৈঠকখানার উপরে উঠিলাম গণককার মহাশয় ঠিক তাহা বুঝিতে পারিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় কে আপনি? উত্তর করিলাম, আমি হাত গণাইতে এসেছি, কোথায় আপনার বাড়ী? আর নামই বা কি আর কাহার নিকট শুনিলেন যে আমি গণিতে পারি? আমি নাম ঠিকানা বলিলাম, আরও

বলিলাম যে বহু লোকের নিকট আপনার গণনার প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছি। গণককার মহাশয় আমাকে বলিলেন হাত গণিতে আমাকে কত দিতে হয় তাহা কি মহাশয় অবগত আছেন? আমি বলিলাম না মহাশয় গণনা করিতে কি দিতে হইবে তাহা আমি জানি না, গণককার মহাশয় বলিলেন অবস্থাপন্ন লোকের নিকট হইতে আমি দুই টাকা লই, তদ্ভিন্ন আর আর গরিবদের নিকট হইতে এক টাকা লই, আমি তখনি বুঝিলাম যে আমাকেও ১৲ টাকা দণ্ড দিতে হইবে, এই দণ্ডের যদি কিছু বাঁচাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি অতি গরিব বলিয়া আট আনা দিতে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রাচীন গণককার তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না, বাধ্য হইয়া ১৲ টাকা না দিলে ফণীবাবুও সন্তুষ্ট হইবেন না গতিকে যোল আনাই আমার দণ্ড। গণনার পূর্ব্বেই যোল আনা তিনি আদায় করিয়া লইয়া সহাস্য মুখে গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে মতলব স্থির করিয়া আমার দক্ষিণ হাতের উপর হাত দিয়া হাতের রেখাগুলি যেন বিচক্ষণ ভাবে তাহার অঙ্গুলির দ্বারা বুঝিয়া লইয়া উর্দ্ধমুখে দৃষ্টি করিয়া মা! মা! শব্দ করিতে লাগিলেন, তাহার গলার আওয়াজ অতি উচ্চ তখন আমার অবস্থা খারাপ, শুনিয়া ভয়ও হইতে লাগিল।

আমার ভয় হইলে তিনি তাহা শুনিবেন কেন? তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি ভয়ে মরিলেও তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী করিবেন না। গণককার মহাশয় হাত ধরিয়া গণিতে লাগিলেন আর মাঝে মাঝে মা মা শব্দ করিতে

লাগিলেন। আমি অবাক, তিনি কেবলই গণিতেছেন আর যা তা বলিতেছেন, আমি কিন্তু চুপ, তখন গণককার মহাশয় বলিলেন মহাশয় আপনি যে কোন উত্তর দিচ্ছেন না? আমি উত্তর দিলাম একটীও মিলিতেছে না, কি করিয়া হাঁ বা না বলি? তখন গণককার মহাশয় বলিলেন সে কি মহাশয় এখানে অনেক সাহেব ও অনেক মেম ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জমিদার ও বিস্তর পণ্ডিত লোকেরা গণাইতে আসেন তাঁহারা ত আপনার মত মিথ্যাবাদী নন, বুঝুন পাঠক পাঠিকারা আমি টাকা দিয়া মিথ্যাবাদী হইলাম। টাকা না দিয়াও ওখান হইতে আসিবার উপায় নাই কারণ যে দুই শ্বেত বর্ণ কুকুর ও কুকুরী দেখিলাম তাহারা উভয়েই যমদূত ও কালদূত বিশেষ টাকা না দিয়া সেখান হইতে এক পাও নড়িবার সাধ্য কাহারও নাই। এখন পর্য্যন্ত গণককার মহাশয় আমার হাত ধরিয়া বসিয়া আছেন, আমিও চুপ করিয়া বসিয়া আছি আর দেখিতেছি কুকুর ২টা আমার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইতেছে, ভয় হইতেছে আমার মিথ্যার যা শাস্তি হয়, আমি বলিলাম গণককার মহাশয় একটু ভাল করিয়া আমাকে দেখুন, তিনি বলিলেন, আপনি কি অবস্থায় পড়িয়াছেন একটুও কি শুনিতে পাই না? আমি এখন বরং দুই একটী মিথ্যা বলিলাম। তিনি আমার নিকট খাঁটি মিথ্যা কথাকয়টী শুনিয়া বলিলেন আপনার জন্মমাস ও জন্মদিন কি মনে আছে? আমি উত্তর করিলাম ফাল্গুণ মাস রবিবার আমার জন্মমাস ও জন্মদিন। তখন আমার হাত ছাড়িয়া বলিয়া দিলেন আগামী রবিবারে বিকালে আপনি আসিবেন, আমি

ঠিক করিয়া সবই গণিয়া রাখিব আসামাত্রই উত্তর পাইবেন। আমি কাতর স্বরে নিবেদন করিলাম আমার আর ত টাকা নাই, আমার কাতর স্বর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং করুণ বচনে বলিলেন আপনার আর টাকা দিতে হইবে না, কিন্তু রবিবারে আসা চাই।

আগামী রবিবারে আমি যাইব মতলব করিয়া রওনা হইলাম। আমার পকেটে প্রায় ২।৪ টাকা থাকে, আমি ভয়ে ভয়ে চলিলাম, কারণ টাকা যদি চাহেন, না দিলে কুকুরে আদায় করিয়া লইবে। কুকুর দেখিলে আমার অত্যন্ত ভয় হয়, কুকুরকে আমি আন্তরিক ঘৃণাও করি। আজকাল দেখিতেছি পিতা মাতাকে সেবা না করিয়া অনেক মহাত্মা কুকুরের সেবা করিতেছেন, অনেকের নিকট কুকুর পিতৃমাতৃর স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি বৈঠকখানায় উঠিয়া দেখিলাম গণককার মহাশয় একজনকে গণনা করিতেছেন, সে বাবুটী ওকালতি পরীক্ষা দিয়াছেন, কি ফল হইবে তাহাই গণাইতে আসিয়াছেন, গণককার মহাশয় বলিতেছেন, আপনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কি প্রথমবারেই পাশ করেন? বাবু বলিলেন, হাঁ মহাশয়! আমি প্রথমবারেই পাশ করি; আই, এ, পরীক্ষায়, তিনি বলিলেন প্রথমবারেই পাশ করি, বি, এ, পরীক্ষায়, তিনি বলিলেন প্রথম বারেই পাশ করি, এই সমস্ত শুনিয়া গণককার মহাশয় উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মা—মা শব্দ করিতে লাগিলেন, বাবুটীর নিকট হইতে গণককার মহাশয় ২৲ টাকা লইয়াছেন, এখনকার মা—মা শব্দ একেবারেই গগন ভেদী, অবিরাম মা—মা শব্দ হইতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে বলিলেন আপনার ষোল আনা পাশের ভাগ্য

আছে, কিন্তু একটু খুঁতও আছে, সে খুঁতে কাজ নষ্ট করিতেও পারে, আবার সে খুঁত সময় বিশেষে কিছুই করিতে পারে না। আমার তখন একটু একটু বিকালে জর হইত, আমি ঐরূপ গণনা শুনিয়া নিজের নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলাম যে নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভয়ানক বেগবতী, কুকুররূপী যমদূত ও কাল দূত আমার সম্মুখে, আমি বুঝিলাম আমার নাড়ী বেগ দিবার কারণ ঐ কুকুরদ্বয়। ক্রমে ক্রমে সকলেই চলিয়া গেলেন, এখন মাত্র আমি রহিলাম, অন্ধ মহাশয় টের পান নাই ইহা আমি বেশ বুঝিলাম, অমনি জুতার গোড়ালি বৈঠকখানায় ঠক্ করিলাম, কে মহাশয়! উত্তর করিলাম আমি মহাশয়, কোথা হইতে এসেছেন, আমি বলিলাম আহিরীটোলা হইতে আসিয়াছি নাম কি? উত্তর দিলাম, আমার নাম দেবেন বাবু, দরকার কি? গণনা, আমাকে ২৲ টাকা দিতে হইবে? না, গরীব দয়া করিতে হইবে, ১৲ টাকার কমে হইবে না; বলিলাম, আচ্ছা! তখন হাত ধরিয়া মা—মা শব্দ করিতে লাগিলেন, আর যা তা বলিতে লাগিলেন, গত শুক্রবারের কথা কয়টী আমার মনে আছে, আজ অন্য রকম কথা শুনিয়া বলিলাম, মহাশয় আপনি আমাকে রবিবারে আসিতে বলিয়াছিলেন, আমি গত শুক্রবারে আসিয়াছিলাম, আজ আমি যে নাম বলিলাম ইহা আমার মিথ্যা নাম, সেদিন আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, সেদিন বলা ঠিক হয় নাই, আজ বলিলেই ঠিক হইত। মহাশয় শনিবারের মধ্যেই আমার হাতের রেখার কি এত গোলমাল হইল? তখন অন্ধ গণককার মহাশয় আমার হাত ধরিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, দেখুন হয় আপনি আমার পুত্র সদৃশ, আর না

হয় আমায় ভ্রাতা সদৃশ, আপনি ইহা কাহাকেও বলিবেন না এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা আমার হাত ধরিয়া বসাইয়া রাখিলেন, আমি বলিলাম মহাশয় আমি অত্যন্ত গরীব, আমার শুক্রবারের টাকাটা ফেরত দেন, গণককার মহাশয় অতি সজ্জন, তখনি আমাকে ১৲ টাকা ফেরত দিলেন, আমি স্বীকার করিলাম যে ইহা কাহাকেও বলিব না। যথার্থ ভারত দ্রব্য ভাণ্ডার ছাড়া ইহা আর কোথাও বলি নাই। এখন দেখিলাম তামাদি বিষয় বলিলে বা লিখিলে দোষ নাই, তাই সাধারণের হিতের জন্য লিখিতেছি। যখন আমি বাটী আসিতেছি, বসিয়া থাকিয়া অনেক বিরক্তও হইয়াছি কারণ আমার একটু ২ জ্বর হয়। যেমন নীচে নামিলাম দেখি, ত্রিশূলধারিণী গেরুয়া বস্ত্র পরিধিতা, তেজস্বিনী মুক্তকেশী, নরমুণ্ডমালাসদৃশা বহু রুদ্রাক্ষমালাধারিণী, লজ্জা সরমবিহীনা, চপলা বেগশালিনী, ললাট দেশে সিন্দুর ভরা, স্থির কটাক্ষ, ভাদ্র মাসের ভরা নদীসদৃশী এক বামা এই দিকে আসিতেছেন, আমি এই বিশাল লোচনা বরবর্ণিনী বামাকে চিনিতে পারিলাম ইনি গঙ্গার ঘাটে মাটিতে ত্রিশূল গাড়িয়া গৃহস্থ ঘরের গিন্নীদের অনেক মাদুলী দিয়া /৫ ৷/৫ লয়েন ইনি বিপথগামী স্বামী ও বিপথগামী পুত্র ও বিপথগামী দাদা ও ভ্রাতাদিগকে সুপথে আনিবার বিস্তর শিকড় ও মাদুলী জানেন। আর বার-২ণিতাদের পালিতা কন্যারা অন্য হাতে ফস্কে না যায় তাহাদের কাছেই থাকে ইহার বিস্তর তুকতাকও জানেন, আমার অর্থ নষ্ট হইলে কিছু দিন আমি স্থানে স্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইতাম অর্থাৎ নিষ্কর্মা লোক যাহা করেন আমিও তাহাই করিতাম,

গঙ্গার ঘাটের ঐ ত্রিশূলধারিণী নির্ভীকা কামিনীকে প্রায়ই মাদুলী পুরিতে দেখিতাম। ঐ আয়তলোচনা, মুক্তকেশী বামা বারবনিতাদের উপপতিদিগকে তাহাদের বশে আনিবার ক্ষমতাও জানেন উহার প্রচুর ক্ষমতা, কেন ঐ বামা একাকিনী গণককার মহাশয়ের বাটীর দিকে আসিতেছেন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল এখন আমার আর তত জরের বেগ নাই, স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম, তিনি আসিয়াই অন্ধ মহাশয়কে কতকগুলি তীব্র গালিগালাজ দিতে লাগিলেন, এবং তাহার ঘৃত ফুরাইয়াছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, আমি বুঝিলাম বোধ হয় রাত্রের হোমের ঘৃত ফুরাইয়াছে, কেন যে তিনি অন্ধ মহাশয়কে এত তাড়না করিতে লাগিলেন ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, সম্পর্ক বিহীন স্থলে তাড়না ও কটু বাক্য কি প্রয়োগ হইতে পারে? পাঠক পাঠিকাগণ, আমার নিবেদন এই, যদি কেউ ঠকেন তবে চোকওয়ালাদের কাছে ঠকিবেন, অন্ধের কাছে যেন কেউ না ঠকেন, আজ কাল বাজারে বিস্তর গণককার, তার মধ্যে অন্ধ গণককারের সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়াছে, অন্ধের কাছে ঠকিলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও কষ্ট। গণককার মহাশয়ের বয়স ৪৬।৪৭ বৎসর তাঁহার মুখে গোঁপ নাই। ত্রিশূলধারিণী দ্রুতগামিনী কামিনীর বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর, তাহার মাথায় খোপা নাই, তিনি এলোকেশী তাহার দন্তপংক্তী মুক্তা গঞ্জিতা, নাসিকা তিল পুষ্পসদৃশী, অধর ওষ্ঠ প্রায়ই তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, বদনমণ্ডল ভ্রুকুটীজালে জড়িত, চোক দুইটী বিশাল বটে কিন্তু গোলাকৃতি, মৃগনয়নী বলা যায় না, হাতে রুদ্রাক্ষের

মালা, বাহুযুগলেও রুদ্রাক্ষের মালা, গলে ত্রিকণ্ঠি রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া বাসে দেহ আচ্ছাদিতা, আমি যদি না জানিতাম তাহা হইলে, তাহাকে যোগিনী বলিয়া নমিতাম, গতি অতি চঞ্চলা, বাণী অতি প্রখরা, তাহার মতির গতি কেমন তাহা কিন্তু লিখিতে পারিলাম না। ঝগড়ার সময় ইহাকে দেখিতে অতি সুন্দর, যেমন মেঘের সময় সৌদামিনী সুন্দর।

যে বিদ্যুৎ রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।

অবৈধ প্রণয়ের শেষ ফল।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বাসন্তীপুর বলিয়া একখানি গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার নাম অমরসিংহ, তিনি জাতিতে রাজপুত তাঁহার বিষয় সম্পত্তি খুব বেশী ছিল। তাঁহার রাণীর নাম মহারাণী ষোড়শীবালা, তিনি অল্প বয়সে এক পুত্র প্রসব করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হন, রাজা মহাশয় পত্নী বিয়োগের পর হইতে সংসারের সকল রকম সুখে বঞ্চিত হইয়া কিছু কাল অতি ম্রিয়মান অবস্থায় কাল যাপন করেন, পুত্র মুখ দর্শন করিয়া অনেকাংশে পত্নী-বিয়োগ জনিত যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পান বটে, কিন্তু ব্যঞ্জন বিহীন অন্ন যেমন রুচিকর নহে, সংসারও তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ হইয়াছিল। রাজকুমারকে প্রতিপালন করার জন্য যথেষ্ট লোক নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু মাতা ছাড়া সন্তানের যত্ন উত্তমরূপে করিতে ইহ জগতে আর কেউ পারেন না, সন্তান যেমন মাতৃহীন, রাজা তেমনি পত্নীহীন, পিতাপুত্রের উভয়েরই সংসারে শান্তি নাই, পুত্র দিন দিন শুক্ল পক্ষের সুধাকরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া পিতৃদেবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। রাজা মহাশয় পুত্রের নাম বিজয়সিংহ রাখিলেন, বিজয়সিংহের বয়স বর্ত্তমান সময় আট বৎসর, অত্যন্ত বাল্য আদর জন্য রাজা ও জমিদার মহাশয়দের কুমারেরা বিদ্যানিধি লাভে বঞ্চিত হন, তবে বাপ মা, ও শ্বশুর শাশুরী প্রাণেশ্বরীকে পত্রাদি লেখার জন্য যৎসামান্য একটু শিক্ষা করেন মাত্র। কুমার বিজয়সিংহ তদ্রূপ যৎসামান্য একটু লেখা পড়া শিখিলেন। ক্রমে ক্রমে কুমারের

বয়স বাড়িতে লাগিল, যেমন কুমারের বয়স বাড়িতে লাগিল রাজা মহাশয়েরও তেমনি বিবাহ দিবার আশাও বাড়িতে লাগিল, আজ কাল কুমার বিজয়সিংহের বয়স ১২ বৎসরের উপর, রাজা মহাশয় সুপাত্রীর অনুসন্ধানে দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কন্যাও বিস্তর মিলিতে লাগিল কিন্তু কুমারের উপযুক্ত মত ও রাজা মহাশয়ের ইচ্ছা মত কন্যার অভাব। কিছু দিন পরে, বাগেরহাট মহাকুমার অধীন গৌতমনগর নামক একটী বিখ্যাত গ্রাম আছে ঐ গ্রামে বিপত্নীক এক রাজা আছেন তাঁহার ৮ বৎসর বয়সের বিধুমুখী নাম্নী একমাত্র সুরূপা কন্যা আছেন সেই কন্যার সহিত রাজা মহাশয় কুমারের বিবাহ দিতে মত করেন, লোকজন যাতায়াত করিয়া কন্যাকে দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া শুভ দিনে ও শুভক্ষণে কুমার কুমারীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এই পরিণয় উভয়ের পক্ষে অতি শুভজনক হইল। বিবাহের পর হইতে কন্যার পিতা কন্যার উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া তাহাকে পাকা সংসারী করিতে লাগিলেন, যেমন শ্বশুর বাড়ীর দশা, তেমনি নিজের বাড়ীর দশা, কন্যা পাকা না হইলে কে ঐ দুই সংসার চালাইবে ?

কন্যা বাপের বাড়ী থাকিয়া সংসারের স্বাধীনতা পাইলে, তাহার গুণরাশি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, কন্যা ইচ্ছামত যথা তথা বেড়াইতে লাগিলেন ; সইস, কোচম্যান ইত্যাদি অধীনস্থ যত লোকজন যাহারা রাজ সরকারে চাকরী করে ঐ রাজকুমারী তাহাদের সকলেরই গিন্নিমা। রাজকুমারীও

বৃদ্ধ রাজার একমাত্র অন্ধকারের আলো, অধীনস্থ লোকেরা কুমারীর অতি প্রশংসা করিতে লাগিল, সে প্রশংসা কেবল চাটুতাপূর্ণ। রাজা মহাশয় কন্যার প্রশংসা শুনিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং কন্যাকে স্বাধীনতার চরমে উঠিয়ে দিলেন, কন্যার বয়স বর্ত্তমানে ১৬ বৎসর, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, ও সংসারের গৃহিণী, আরও যোড়শী যুবতী। পাঠক পাঠিকাগণ একটু ভাবিয়া দেখুন, ক্ষণপরে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে। একে যুবতী, তাহাতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, আরও সংসারের গৃহিণী, ও পিতৃ আজ্ঞায় স্বেচ্ছা-চারিণী, আর পিতৃ গৃহেও বাস, সর্ব্বনাশ ত উপস্থিত হইয়াছে, যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে তাহার সংশোধনের আর রাস্তা নাই। কন্যা অধীনস্থ চাকর একজন ঘোড়ার ঘেসেড়ার সহিত অবৈধ প্রণয় সূত্রে একেবারেই আবদ্ধ হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন যৌবনের প্রথম দশায় প্রণয়, হয় জীবনকে ভস্মীভূত করে, আর না হয় স্বর্গের সুপ্রশস্ত নন্দনকাননে লইয়া যায়, রাজ-কুমারী এখন নন্দনকাননের দিকে খুবই অগ্রসর। স্ত্রী জাতির প্রণয় বন্যার জলের মত যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। স্ত্রীলোকের প্রণয় পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, স্ত্রী জাতির দ্বারা কার না মন খণ্ডন হয়? স্ত্রী জাতিই সংসারের সর্ব্বনাশ। হা সর্ব্বনাশিণী! তুই গোপনে গোপনে কি সর্ব্বনাশ করিলি! তোর আত্মা কি নরকে স্থান পাবে? তুই কোন্ বংশের কন্যা? তোর দ্বারা কার না সর্ব্বনাশ হইতে পারে? তুই কি সর্ব্বনাশের তরণী? ঐ তরণী আরোহণ করিলে মাত্র সমুদ্রের ভিতর ডুবিয়া মরিতে হয়, যে ডোবে সে ত আর ভাসে

না। কলঙ্কিনী! তোর চারুশোভার সৌন্দর্য্য কি ঐ খেসেড়ার পদে বিনামূল্যে যৌবন বিতরণ? তুই কি পবিত্র রাজকুলে কালি দিতে জন্মেছিলি? তোর মত পিশাচিনী এ জগতে কি আরও আছে; বিধুমুখী! তোর বিধুমুখে খেসেড়ার অমানিশার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে একবার দর্পণে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ্।

অনেক দিন বিবাহ হইয়াছে, বিজয়সিংহ শ্বশুরবাটীতে যান নাই, এবং স্ত্রীকেও বিবাহের পর আর দেখেন নাই, আজ মনে মনে পত্নী-দর্শনের ইচ্ছা অতি প্রবল হইয়া উঠিল, পিতার নিকট হইতে অনুমতি লইবেন যে আগামীকল্য শ্বশুরবাড়ী পত্নীকে আনিতে যাইবেন, পিতা অনুমতি দিলেন, হাঁ বৎস! তুমি বধূমাতাকে লইয়া আসিবে, এত দিন আনাই উচিত ছিল, আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরই গমন কর। পর দিন শ্বশুরবাটী যাইবার পূর্ব্বেই দূত প্রেরণ করিলেন, যে জামাতা বাবু আসিতেছেন, শ্বশুর মহাশয় সংবাদ পাইয়া জামাতা আসিতেছেন বলিয়া মাঙ্গলিক ক্রিয়া কলাপ ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই জামাতা বাবু শ্বশুরবাটীতে উপস্থিত হইলেন। খাওয়াদাওয়ার যোগাড় হইতে লাগিল, সংসারে বিধুমুখীই গিন্নি তিনি সবই যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন, আজ বিধুমুখী সংসারে আবদ্ধ খেসেড়ার সঙ্গে সময় মত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, খেসেড়ার নাম তিতু বাগ্দী, বয়স ২৮।৩০ বৎসর রং আলকাতরার মত, মাথায় বাবরি চুল, পায়ে হাজা, দেখিতে ঘোর অন্ধকার, তাহার দেহের মধ্যে কেবল মুখের দাঁতগুলিই সাদা, পরিধানে তেল

মাথায় একখানি গামছা, কাঁধেও তদ্রূপ আর একখানি গামছা আছে। বিধুমুখী সময় মত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিতু অভিমানে বাঁশের বাখারীর মাচানের উপর পা গুটাইয়া ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছে, জামাতা বাবু আসিয়াছেন তাহাও তিতু শুনিয়াছে, তাহার আজ বিষম চিত্ত বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তিতুর ইচ্ছা হয় মরিবে, না হয় মারিবে, রাজকুমারী রাত্র ৮টার সময় তিতুর নিকট গিয়া দেখেন, যে তাহার চক্ষে পলক পড়িতেছে না একদৃষ্টে উর্দ্ধে নজর রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে, বিধুমুখী অপরাধিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন হাঁগা কি অপরাধ করিয়াছি যে মুখ ভার করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া আছ, আমার দিকে একবার তাকাও, তিতু বলিল তোমার দিকে যে তাকাবে সে ত আসিয়াছে বরং তুমি আমার গলায় এই বাঁশ কাটা কাস্তে বসাইয়া দাও আমার চির শান্তি হোক, আর সহ্য করিতে পারি না, তখন বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, অনেক সাধ্য সাধনার পর কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, বিধুমুখী বলিলেন আমি স্বামীকে না খাওয়াইয়া আগে তোমাকে খাওয়াইব এই বলিয়া বাটী হইতে স্বর্ণপাত্রে খাদ্যাদি ও জলপাত্রে জল লইয়া আসিল, তিতু আহার করিবার পূর্ব্বেই বলিল, তুমি যদি তোমার স্বামীর গলা কাটিয়া ফেলিতে পার তবে আমি আহার করিব, বিধুমুখী এক বাক্যে স্বীকার করিল হাঁ আমি তোমার হুকুমই পালন করিব, তুমি আহার কর, একটু বেশী রাত্রে কর্ত্তা ঘুমাইলেই আমি স্বামীকে সাবাড় করিব। এই প্রস্তাবে রাজকুমারী

স্বীকৃত হইলে তিতু আহারাদি করিল এবং একখানি ধারালো কাস্তে রাজকুমারীকে দিল, রাজকুমারী কাস্তে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়া, সকলকে আহারাদি করাইয়া নিজে আহার করিয়া ঘরে গিয়া দেখেন যে স্বামী নিদ্রিত হইয়াছেন, আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ধারালো কাস্তে বিজয়সিংহের গলদেশে বসাইয়া দিয়া একেবারেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। হা হতভাগিনী কর্‌লি কি? অমরসিংহের অমূল্য নিধির প্রাণ সংহার করিলি! তুই না পারিস এমন কাজ কিছু কি আছে? রাক্ষসী. তুই ভাবিয়া দেখ, সিংহী, ব্যাঘ্রী, ইহারাও স্বামীর মাংস ভক্ষণ করে না, রাক্ষসেও স্বজনকে হত্যা করে না, ক্রুর জাতি যে সর্প সেও স্বামীকে ছোবল মারে না, তুই কি তাদের অপেক্ষাও অধম। অথবা তুই পর সুত-ঘাতিনী কংস সহোদরা পুতনা। স্বামী হত্যা করিয়া রক্ত মাখান কাস্তে লইয়া তিতুর নিকট উপস্থিত হইল, তিতু কাস্তে দেখিয়া বুঝিল, নারী জাতি সব পারে, তিতুর চোক ফুটিল, প্রেমের ঘোর নেশা কাটিল, বিধুমুখী যে শঠতার খনি তাহা বুঝিয়া তিতু স্তম্ভিত হইল। তিতু বলিল যে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে ও মূল্যবান বস্ত্রাদি আছে তাহা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া লইয়া আইস, আর বিলম্ব করিও না, এখান হইতে সত্বর বাহির হইতে হইবে, জানাজানি না হইতেই সরিতে হইবে। রাজকুমারী ঘরে গিয়া স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কার এবং বস্ত্রাদি সমস্ত লইয়া তিতুর নিকট উপস্থিত হইল, তিতু আর বিলম্ব না করিয়া একেবারেই দক্ষিণ দিক রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল [illegible] লতার সদৃশ সহকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল কতক দূর গিয়া

সম্মুখে এক নদী দেখিল, নদী পার হওয়া বড়ই শক্ত, বিশেষ স্ত্রীলোকেরা সাঁতার দিয়া নদী পার হইতে পারে না, আবার অনেকে সাঁতার না দিয়াও মায়ানদী পার হইতে পারে। তিতু বিধুমুখীকে বলিল তুমি পরণের কাপড় খুলিয়া বেশ করিয়া পুটুলী বাঁধিয়া দাও আমি লইয়া গিয়া পর পার হইতে তরণী লইয়া আসি, বিধুমুখী বলিল আমি যে উলঙ্গিনী হইব? তিতু বলিল কাপড় না দিলে যদি কেহ আসিয়া তাড়া করে তুমি কাপড়ে বাঁধিয়া পড়িয়া যাইতে পার, অতএব কাপড় খুলিয়া দাও, সঙ্গত কথা বুঝিয়া কাপড় খুলিয়া দিলেন, পুটুলী মাথায় করিয়া তিতু অনায়াসে নদী পার হইয়া পর পারে গিয়া নৌকার উপর পুটুলী রাখিয়া কাপড়খানি পরিয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

এদিকে রাজকুমারী নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য শরীর অর্দ্ধ জলে মগ্ন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, আর বুঝিলেন যে নরহত্যা দেখিয়া তিতুও আমাকে ঘৃণা করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গেল। হা ভগবান তুমি হতভাগিনীকে রক্ষা কর আমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ কর, ভগবানকে ম্রিয়মান হইয়া ডাকিতে থাকায় পাপিনীর উপর ভগবানের ত্বরায় দয়া হইল কেননা দয়া না হইলে আরও নরহত্যা বাড়িবে, এই জন্য পাপিনীদের উপর ভগবানের অতি শীঘ্র দয়া হয়, ভগবান মায়া করিয়া এখন তিন মূর্ত্তি হইলেন, ভগবতী হলেন একটী শেয়াল, ধর্ম্ম হলেন বেঙ্গী, মহাদেব হইলেন শোল মাছ বিধু-মুখী দেখিতেছেন, শেয়াল এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া আসিতেছে, এমন সময় শোল মৎস্য নদীর জল হইতে লাফ

দিয়া ডাঙ্গায় পড়িতে লাগিল, শেয়ালের অতিশয় লোভ হইতে লাগিল, কিন্তু মাংসখণ্ড ডাঙ্গায় রাখিয়া শোল ধরিতে গেলে বেজিতে মাংসখণ্ড লইয়া যাইতে পারে এইরূপ ভাবিতে লাগিল, এমন সময় শোল মৎস্য ক্রমাগত ডাঙ্গায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল কিন্তু শেয়ালী লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মাংসখণ্ড মাটিতে রাখিয়া যেমন শোল মাছ ধরিতে গেল অমনি বেজিতে মাংস লইয়া প্রস্থান করিল, আর মাছও জলে একেবারেই ডুবিয়া গেল, শেয়ালী মাছ ও মাংস দুইই হারাইল। এমন সময় অর্দ্ধ জলমগ্না রাজকুমারী বলিতেছেন—

নেউলে নীয়তে মাংসঃ মৎস্যানঃ সলিলাং গতাঃ
মৎস্য-মাংস পরিভ্রষ্টাঃ কিং নিরিক্ষ্য জম্বুকীঃ।

হে শেয়ালী, তোমার মাংসখণ্ড বেজিতে লইয়া গেল, আর মাছও জলে ডুবিয়া গেল, মাছ ও মাংস দুইই তুমি হারাইলে এখন তুমি কি দেখিতেছ? তখন শেয়ালী বলিল—

আত্মছিদ্র ন জানাসি পরো ছিদ্রানুসারিণী,
যঃ স্বহস্তে পতি হস্তাঃ জলে নগ্না কিমদ্ভুতং।

তুমি তোমার নিজের ছিদ্র দেখছো না, কিন্তু পরের ছিদ্র দেখিয়ে দিচ্ছ, তুমি নিজ হাতে পতি বধ করিয়া যে জলে উলঙ্গাবস্থায় ডুবিয়া আছ ইহার চেয়ে কি আমার মাংসখণ্ড হারান বেশী আশ্চর্য্য?

তখন রাজকুমারী বলিলেন,

কামে মত্ত প্রলোভেন কুকার্য্য ক্রিয়তে মম
কিং করোমি কঃ গচ্ছামি হে সখি বচনং বদ।

আমি কামে ও লোভেতে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছি, হে সখি শৃগাল! এখন আমি কি করি এবং কোথায় যাই তাহাই আমাকে উপদেশ দাও।

শৃগাল বলিল,

গচ্ছ গচ্ছ গৃহে গচ্ছ যাবৎ তিষ্ঠতি সর্ব্বরী
ভাবিত চোর চৌরেণ মম স্বামী নিপতিতঃ।

যাও যাও গৃহে যাও এই রাত থাকিতেই বাটী গিয়া এইরূপ শব্দ করিও যে দেখ চোরে আমার স্বামীর গলা কাটিয়া আমাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিল।

রাজকুমারী বাটী গিয়া ঐরূপ উপদেশ মত চীৎকার করিতে লাগিলেন সকলে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে স্বামীহত্যা, তখন রাজাদেশে চোর গ্রেপ্তারের জন্য লোকজন বাহির হইয়া ঐ খেসেড়া তিতু বাগ্দীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার ফাঁসির দণ্ড হইল। তাহার নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং পুটুলীও পাওয়া গেল। গরিবের যে ভাবে চলা উচিত তিতু কিন্তু উচ্চ আশা পাইয়া তাহা ভুলিয়া এখন ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া মরিল। একটী কুলটার দ্বারা কত পুরুষের অকাল অপমৃত্যু হয় তাহা বিধুমুখী হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করুন। সমানে অসমানে যোগ হইলে দুর্ব্বলের প্রাণ নাশ হয়।

ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আবার তাহাকে রক্ষা করেন।

পূর্ব্বকালে পাটনার অন্তঃর্গত বিকাশপুর নামক একখানি বড় গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামখানি লছমনলাল পাঠক নামক এক রাজার বাসের জন্য বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। রাজা মহাশয় অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পরদুঃখে কাতর ছিলেন, তাঁহার রাণীর নাম রেণুবালা রাজা ঐ রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কারণ রাণীর অত্যন্ত সদগুণ ছিল, প্রধান গুণ এই যে তিনি প্রত্যেক দিন অতিথি ভোজন না করাইয়া নিজে কখনই অন্ন গ্রহণ করিতেন না, তিনি যথার্থই কাঙ্গালের মা রাণী। তাঁহাকে রাণী বলিয়া ডাকিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহাকে রেণুবালা বলিলে যথেষ্ট তুষ্ট হইতেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪২ বৎসর তাঁহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম রাধারাণী কনিষ্ঠার নাম রাজলক্ষ্মী, দুই সহোদরা সৌন্দর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা চন্দ্রজায়া রোহিণী ও রেবতী, উহারা দুই বোনই ঐ বাটীর রাজলক্ষ্মী। জ্যেষ্ঠার বয়স আন্দাজ ২০ বৎসর কনিষ্ঠার বয়স ১৭ বৎসর, এই দুই কন্যা ছাড়া রাজামহাশয়ের আর একটী পুত্র সন্তান আছে তাহার বয়স ১৫ বৎসর তাহার নাম জয়পাল, জয়পাল অতি পবিত্র চরিত্রের আধার তাহার শরীরে রাগ দ্বেষ বা প্রজাপীড়ন ইত্যাদির কোনই চিহ্ন ছিল না, তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি সহাস্য মুখ পঞ্চানন সামান্যতেই সন্তুষ্ট।

তাহার কলেবর উন্নত নহে, দেহে আত্মগরিমার কোন চিহ্ন নাই, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অসীম সৌন্দর্যশালী, ললাট-দেশ প্রশস্ত, আজানুলম্বিত বাহুযুগল দেখিলে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান বলিয়া অনুমিত হইত। রাজামহাশয় পত্নী, পুত্র ও কন্যাদ্বয় লইয়া যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতেন, সকলেই সৎ ও সাধু আর চরিত্রবান হইলে সংসারে অনুতাপের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না, আজ কাল এইরূপ সংসার পাওয়া দুর্লভ।

রাজামহাশয়ের ইচ্ছা হইল তিনি নিকটবর্ত্তী ময়দানে একটী নুতন বাজার স্থাপন করিবেন, ঐ বাজারের নাম রাখিলেন রাজলক্ষ্মী বাজার; ঐ বাজারে যে সকল লোক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিবে, সন্ধ্যার মধ্যে কাহারও কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে রাজামহাশয় উহা নিজে দাম দিয়া খরিদ করিয়া লইবেন, এই ঘোষণা হওয়াতে বাজারটী অতি ত্বরায় উন্নতির পথে দাঁড়াইল, সকাল হইতে যত দ্রব্যাদি আসিত সন্ধ্যার মধ্যেই প্রায়ই সব বিক্রয় হইয়া যাইত, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিত, রাজামহাশয় উহার কথানুযায়ী নগদ মূল্যে তাহা খরিদ করিয়া বিক্রেতাকে তুষ্ট করিয়া বাটীতে পাঠাইতেন। এইরূপ অনেক সময় নিজে দাম দিয়া বিক্রয়াবশিষ্ট দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া নিজের কথা বজায় করিতেন। এক দিন একটী বিক্রেতা বাজারে একটী পুতুল বিক্রয়ার্থে আসিয়াছিল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার পুতুলটী বিক্রয় হয় নাই, সন্ধ্যার পর সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, রাজামহাশয়ের কানে সেই করুণ ক্রন্দন প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহাকে ব্যথিত করিল, রাজামহাশয় তদ্দণ্ডে বাজারে গিয়া বিক্রেতাকে

সান্ত্বনা করিয়া তাহার পুতুলের দাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে ইহার খাটি মূল্য ২৲ টাকা, রাজামহাশয় তাহাকে দুই টাকা দিয়া ঐ পুতুল খরিদ করিলেন। বিক্রেতা বলিল মহাশয় ঐ পুতুলের দৈনিক সন্ধ্যাবেলায় পূজা করিতে হইবে পূজা না করিলে উহার দ্বারায় বিশেষ অপকার হইবে, রাজামহাশয় বলিলেন কি প্রণালীতে উহার পূজা করিতে হইবে? বিক্রেতা বলিল উহার নাম অলক্ষ্মী, লক্ষ্মীপূজা করিতে যে সমস্ত দ্রব্য দরকার উহার পূজা করিতে তাহার বিপরীত দ্রব্যাদির দরকার যথা কুলার উল্টা পিঠে গোবরের ছড়া, ফুলের দরকার নাই, ফলের মধ্যে চালতা, শাক বাজান বন্ধ, ঘণ্টার দরকার নাই, ঘটী বাজান, বসিবার আসনের দরকার নাই, দাঁড়াইয়া পূজা, প্রসাদ পাবে কুকুরে আর শেয়ালে। রাজামহাশয় এই সমস্ত নিয়ম অবগত হইয়া পুতুল বাটীতে লুকাইয়া রাখিলেন, বাটীস্থ কাহাকেও কোন কিছু বলিলেন না, পর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূজার দ্রব্যাদি নিজে আয়োজন করিয়া পূজার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় যখন ঘটী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখনি, বাটীতে বাঁধা লক্ষ্মী ছিলেন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা! আজ রাজপ্রসাদ কাঁপিতেছে কেন? বিশেষ কিছু অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, আপনি কি করিতেছেন? রাজামহাশয় বলিলেন মা আমি এই পুতুল পূজা করিতেছি, অন্নপূর্ণা দৃষ্টি করিয়া বলিলেন বাবা! করেন কি? অলক্ষ্মীর পূজা, বাবা! সত্বর ত্যাগ করুন, না মা! আমি ত্যাগ করিতে পারিব না, বাবা যদি ত্যাগ না করেন তবে আমরা প্রাসাদে যে থাকিতে পারিব না, রাজামহাশয় বলিলেন মা তোমরা আমাকে

ত্যাগ করিও না আমি তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতেছি না, রাজামহাশয় যখন দাঁড়াইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন তখন লক্ষ্মী আর থাকিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী প্রস্থান করিলে ক্ষণপরেই সরস্বতী আসিয়া উপস্থিত, বাবা। করিতেছেন কি? আজ রাজপুরী কাঁপিতেছে বিষম অমঙ্গল দেখিতেছি, বাবা! ক্ষান্ত হউন, আর যে ভদ্র নাই, না মা! ক্ষান্ত হইতে পারিব না, বাবা তবে আমাদের বিদায় দেন, আচ্ছা মা! যদি তোমরা স্বইচ্ছায় আমায় ত্যাগ কর তবে আর কি বলিব তোমাদের অভিপ্রায় মত কার্য্য কর। সরস্বতীও চলিলেন। রাজামহাশয়ের বাহ্য দৃষ্টি একেবারেই শূন্য হইয়াছে তিনি অলক্ষ্মীর পূজায় উন্মত্ত হইয়াছেন, এমন সময় রাণী আসিয়া উপস্থিত, মহারাজ! আজ এত অমঙ্গল কেন তোমার পুরের সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী সরস্বতী কোথায়? মহারাজ! শূন্য পুরীতে তুমি কি অলক্ষ্মী লইয়া থাকিবে? মহারাজ! সব যে যায় আর ত রক্ষা নাই এখনও উপায় আছে আপনি অলক্ষ্মী ত্যাগ করুন আমি গিয়া অন্নপূর্ণা ও বীণাপাণীকে লইয়া আসি মহারাজ সর্ব্বনাশ হইল, তোমার আদরের কন্যাদ্বয় ও পুত্র সকলেই এদিকে ছুটিতেছে আর রক্ষা নাই এই বেলা অলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া সকলকে রক্ষা করুন। মহারাণী সব যাউক, আমি কাহারও জন্য ভাবিব না, কন্যা ও পুত্র আসিয়া উপস্থিত, বাবা! সর্ব্বনাশ হইল পুরীতে আর থাকিতে পারিলাম না যেন গায়ে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে, আপনি যে এই সর্ব্বনাশের কারণ; শুনিলাম অলক্ষ্মীর পূজা করিতেছেন, যে পুরীতে দিবানিশি আনন্দের ঢেউ উঠিত,

আজ সে রাজপুরী বিকট শিবাগণের ক্রন্দনধ্বনিতে পূর্ণ. বুঝিলাম সময় বিরুদ্ধ হইলেই বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও হ্রাস হয়, আমাদের অনুরোধ, আমাদের একটা কথা শুনুন। না যা আর শুনিতে পারিব না তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। এই উত্তর দিয়া রাজামহাশয় পূর্ব্ববৎ পূজা আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ক্রমে রাজপুরীর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাণী, কন্যা-দ্বয় ও পুত্র সকলেই চলিয়া জঙ্গলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজার ও রাজ্যের মমতা কেহই ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁহারা সকলেই গাত্রদাহে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন, সাহস করিয়া কেহই রাজসন্নিধানে আসিলেন না। কিছু দিন পরে ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, রাজামহাশয় এই পুরীর সুশ্রী দূর হইতেছে কেন? শুনিলাম লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাণী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি অরণ্যে গিয়া বাস করিতেছেন, তাহার কারণ আপনার অলক্ষ্মী পূজা, যেথানে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব সেখানে কি লক্ষ্মী, শ্রী এবং সৌন্দর্য্য বাস করিতে পারে? আমার অনুরোধ আপনি অলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুখী হইয়া আরামে রাজ্য ভোগ করুন। না ধর্ম্ম তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না আমি মুখে যাহা বলিয়াছি তাহাই করিব, মুখের কথা পালন না করাই অধর্ম্ম, তখন ধর্ম্ম বলিলেন মহারাজ সকলেই যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আমিও বিদায় চাই, কি বলিলে ধর্ম্ম! তুমি কোথায় যাবে? আমি ত তোমাকেই পালন করিতেছি. যাও দেখি তুমি কোথায় যেতে পার, তোমার মুখে চলে৽ যাওয়া শুনিয়া আমি কি ভীত হইব? তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই যে আমার প্রধান

ধর্ম্ম। তোমাকে রক্ষা করিলে তাহাকে কি এইরূপ কথা শুনিতে হয়? হা ধর্ম্ম! তোমারও ভ্রম হইতেছে, ভ্রম মানবে সম্ভবে কিন্তু দেবে নয়। ধর্ম্ম যথাস্থানে গিয়া থাক, আর বাকচাতুরী করিও না। ধর্ম্ম দেখিলেন যে মুখের কথা পালন করিতে পারে সেই আমাকে রক্ষা করিতে পারে, অতএব রাজা নির্দ্দোষ। ধর্ম্ম তখনি যথাস্থানে গিয়া তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এখন ক্রমে ক্রমে স্বয়ং লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাণী কন্যাদ্বয় ও রাজকুমার সকলেই বাটী আসিয়া যথা যথা স্থানে যাঁহার যে কাজ, সেই কাজে লিপ্ত হইলেন। অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আবার তাহাকে রক্ষা করেন।

মায়াবিনী মরীচিকা।

বহুকাল পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কোন এক কুলীন ব্রাহ্মণ কুমার কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বৎসর। ঐ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কুমার পূর্ণ যুবক, আকর্ণ বিস্তৃত সুবঙ্কিম নয়নদ্বয়, মুখমণ্ডল শরৎশশীর ন্যায় অকলঙ্ক, নাসিকা খগচঞ্চুবিশেষ, গলদেশে কম্বুগ্রীবার ন্যায়, বাহুদ্বয় করীশুণ্ড সদৃশ, স্ফীতবক্ষস্থল, উহার দেহের রং লোহিত-রাগ-রঞ্জিত। যুবকের পরিধানে সুন্দর একখানি পট্টবস্ত্র, গায়ে একটা সাদা কামিজ গলদেশে মূল্যবান একটী উড়ানি, তাহার দশ আঙ্গুলে দশটী স্বর্ণ ও হীরক খচিত অঙ্গুরী, হাতে একটী ছোট পরিষ্কার চর্ম্মের মূল্যবান ব্যাগ, যুবক এই অবস্থায় শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। যেমন যুবকের আকৃতি সুন্দর তেমনি তাঁহার গাত্রাভরণও সুন্দর। হঠাৎ দেখিলে যেন তাহাকে শিখীবাহন কার্ত্তিক বলিয়া অনুমান হয়; যুবক ষ্টেসনে টিকেট্ করিবার পূর্ব্বে পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একজন গুণ্ডা উঁহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল যাহার হস্তের আঙ্গুলে দশটী স্বর্ণ ও হীরক খচিত অঙ্গুরী আছে, না জানি উহার হস্তস্থিত ব্যাগে কত গিনি ও স্বর্ণালঙ্কার আছে। কিরূপে উহাকে নষ্ট করিয়া উহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিব.এই অভিপ্রায়ে গুণ্ডার অন্তঃকরণ অতিশয় বেগবান হইয়া তাহাকে অস্থির করিতে লাগিল। গুণ্ডা নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় কোথায় যাইবেন, যুবক উত্তর করিলেন বনগ্রাম ষ্টেসনে যাইব, গুণ্ডা শুনিয়া যুবকের অদৃশ্যে থাকিয়া তাহাকে সতর্কভাবে দেখিতে লাগিল,

যুবক যথার্থই বনগ্রামের টিকেট কাটিল, গুণ্ডাও বনগ্রামের এক খণ্ড টিকেট কাটিল, যুবক যে গাড়ীতে উঠিলেন, গুণ্ডাও সেই গাড়ীতে উঠিল, কিন্তু যুবক গুণ্ডাকে আর দেখিতে পাইলেন না। গাড়ী যেমন বনগ্রামে গিয়া থামিল গুণ্ডা তৎক্ষণাৎ নামিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় কোথায় যাইবেন ? যুবক বলিলেন আমি শঙ্করপুর যাইব, যুবক জিজ্ঞাসা করিল আপনি কোথায় যাইবেন ? গুণ্ডা বলিল আমিও শঙ্করপুর যাইব, যুবক বলিলেন কি জন্য যাইবেন, গুণ্ডা বলিল আমি একটী তদন্তে যাইব, তখন যুবক বুঝিলেন, যে হয় ত বা ইনি পুলিশ কর্ম্মচারী হইবেন আর কথা না বলিয়া দুই জনে এক খাবারের দোকানে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া ৪টার পর হইতে রাস্তা দিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলেন, গুণ্ডার হাতে বড় একটী লাঠি ছিল, তাহার মাথা গোলাকৃতি, লাঠিটী খুবই শক্ত, ভদ্রলোকেরা ওরূপ লাঠি ব্যবহার করেন না, কিন্তু লাঠি দেখিয়া যুবকের মনে কোনও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই।

যুবক অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, গুণ্ডাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে, পথিমধ্যে গুণ্ডা একবার লাঠি তুলিয়া যুবককে যেমন আঘাত করিবে অমনি একটী লোক পার্শ্বের ময়দান হইতে বাহির হইল দেখিয়া গুণ্ডা নিরস্ত হইল, আর কতক দূর গিয়া গুণ্ডা পুনরায় লাঠি উত্তোলন করিয়া যেমন যুবককে খুন করিবে অমনি দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া দেখিল ময়দানে কতকগুলি শ্রমজীবি লোক বেড়া বাঁধিতেছে, গুণ্ডার উদ্দেশ্য এবারও সম্পন্ন হইল না, যুবক কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন,

গুণ্ডা শুনিতে শুনিতে অনুসরণ করিতেছে আবার কখনও কখনও কথার প্রত্যুত্তর দিতেছে, এইরূপে প্রায় শঙ্করপুরের কাছাকাছি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যুবক বলিলেন আর ১৫ মিনিটের পথ মাত্র আছে, এই অবসরে গুণ্ডা পুনরায় লাঠি উত্তোলন করিয়া দেখে একটী সংকীর্ত্তনের দল ঐ শঙ্করপুর হইতে বাহির হইয়া এইদিকে আসিতেছে, গুণ্ডা তিন বারে তিনটী বাধা পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল আমি বহু প্রাণ নষ্ট করিয়াছি কিন্তু এরূপ বিঘ্ন ত কখনও ঘটে নাই, আচ্ছা উহার বাটীতে গিয়া উহাকে খুন করিব এই মতলবে গুণ্ডা যুবকের বাটীতে উপস্থিত হইল। যুবক উহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং একটী ভদ্রলোক আহার করিবেন বলিয়া আসিলেন। বাটীতে তাঁহার এক বিধবা জ্যেষ্ঠা সহোদরা আছেন আর তাঁহার একমাত্র যুবতী পত্নী আছেন এবং আর একটী ঝী আছে। বৈঠকখানা পাড়াগাঁয়ের চালা ঘর, বাড়ীর মধ্যের ঘরগুলিও চালা ঘর কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানা বিশ্রী কারণ পুরুষের সমাগম না থাকিলে বৈঠকখানার সৌন্দর্য্য থাকে না, বৈঠকখানায় বাঁশের ছেঁচা বেড়া, বেড়ার ফাঁক দিয়া বাড়ীর ভিতরের ঘর দরজা ও কোথায় কি আছে তাহা সবই দেখা যায়, গুণ্ডা উঁহার বাটীর ভিতরের যাহা কিছু সবই দেখিতে লাগিল। যুবক গুণ্ডাকে খাওয়াইবার জন্য নিকটস্থ দোকান হইতে খাবার আনিতে গিয়াছেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবক আসিয়া গুণ্ডাকে জলযোগ করাইয়া, বিছানা দিয়া বৈঠকখানায় আরাম করিতে অনুমতি করিয়া নিজে বাটীর

ভিতর গিয়া উত্তরের ঘরে একটী মাদুর ও বালিশ লইয়া যুবক গড়াইতে লাগিলেন, সমস্ত ঘরে প্রদীপের আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, যুবক ব্যাগটী একটী হরিণের শিং টানান ছিল তাহাতে ঝুলাইয়া রাখিয়া ৮টী স্বর্ণ অঙ্গুরী ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, আর হীরকনির্ম্মিত দুইটী অঙ্গুরী দুই-হাতের দুটী তর্জ্জনীতে থাকিল। যুবক পরিশ্রম-কাতর, তিনি একটু নিদ্রিত হইলেন।

গুণ্ডা দেখিতে লাগিল যুবকের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে একটী দরজা বসান আছে ঐ দরজা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সদর দ্বার। দরজার দক্ষিণ পার্শ্বে বড় একটী গোলা আছে অর্থাৎ ধান্যাদি রাখিবার যায়গা, তার পাশে গরু থাকিবার একখানি জীর্ণ ঘর আছে। গুণ্ডা বুঝিল দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া অনায়াসে বাহির হইতে পারিবে। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিল, তখনি যুবকের জ্যেষ্ঠা সহোদরা যুবককে ডাকিলেন, বাহিরে খাবার দিয়ে এস, যুবক উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে ভদ্রলোকটী ঘুমাইতেছে তাহাকে ডাকিলেন, গুণ্ডা ঘুমের ভান করিয়া উত্তর দিয়া উঠিলে, যুবক খাবার আনিয়া গুণ্ডাকে খাওয়াইয়া, নিজে গিয়া আহার করিলেন, পরে পূর্ব্বের মাদুর ও বালিশের উপর শয়ন করিলেন, কিন্তু ঐ ঘরে একটী প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, যুবক শয়ন মাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরেই ঝী মাগী চলিয়া গেল, এবং ক্ষণপরেই যুবকের জ্যেষ্ঠা সহোদরা তাঁহার নিজের ঘরে গেলেন, যুবকের পত্নী আসিয়া সেই সদর দরজাটী খিল

বন্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বহু দিন পরে স্বামী বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যেন কোনই উৎসাহ নাই তিনি কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, গুণ্ডা দেখিতেছে, যে ঐ স্ত্রীলোকটী অলোকসামান্য রূপসী বয়সও ১৬।১৭ বৎসরের বেশী হইবে না, কেন যুবতী ঘুরিতেছেন গুণ্ডা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার চিত্তে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তাহাকে সতী কি অসতী কিছু বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে রাত প্রায় সাড়ে এগারটা বাজিল, গুণ্ডার ঘুম নাই আর যুবকের স্ত্রীরও ঘুম নাই, পাপীর মন সর্ব্বদা চঞ্চল, প্রাপীরা শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে না, পাপীদের চিত্তে সর্ব্বদাই আতঙ্ক। যুবকের স্ত্রীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর তাহার গতি চঞ্চলা চপলা বিশেষ. হেলিয়া দুলিয়া চারিদিকে নজর রাখিয়া কখনও দ্রুত পদ-বিক্ষেপ করিতেছেন আবার কখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন, আবার কখনও স্বামীর ঘরের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন আবার কখনও জ্যেষ্ঠা বিধবা সহোদরার দাওয়াতে উঠিয়া তাহার ঘুম কি জাগরণ পরীক্ষা করিতেছেন, নারী জাতির চঞ্চল মানসের গতি কেহ স্থির করিতে পারে না, কেন এই ষোড়শী এইরূপ করিতেছেন গুণ্ডা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্থিরভাবে উহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে, বাহিরে আলো জ্বলিতেছে তাহাতে গুণ্ডা উহার সর্ব্বাঙ্গ বেশ দেখিতে পাইতেছে, গাভী বৎসহারা হইলে যেরূপ চকিতা হয় সুন্দরীও সেইরূপ চকিতা। আজ তাহার মনের সুখ নাই. কেন যে সে এত বিচলিতা তাহা কে

বুঝিবে ? শ্রীমতি-রাই রাসেশ্বরী আয়ান-গৃহে থাকিয়া এইরূপ অসুখী ছিলেন, আয়ানকে দেখিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া দিত, এ সুন্দরী কি সেইরূপ নিকুঞ্জে কোন কালারূপী কালি পূজা করেন, না ব্রজবালা যেমন কদম্ব মূলে সকলে একত্রিত হইয়া কালাচাঁদকে ভজনা করিতে গভীর নিশীথে প্রস্থান করিতেন ইনিও কি সঙ্গিনীগণের আগমন প্রতীক্ষায় চকিতার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, না বংশীধারীর অধর ওষ্ঠ চুম্বন করিতে না পারিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া দিকবিদিক শূন্য হইয়াছেন। গুণ্ডা কত কি ভাবিতেছে, রাত ১২॥ সাড়ে বারোটা বাজিল, এমন সময় পাড়াগাঁয়ে চৌকিদার হাঁক দিল, যেমন চৌকিদার হাঁক দিল অমনি সুন্দরী সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চৌকিদার সদর দরজার কাছে আসিয়া দরজায় অঙ্গুলী দ্বারা টোকা মারিল, সুন্দরী বলিল, আজ তুমি যাও, আমার স্বামী বাটী আসিয়াছেন, চৌকিদার বলিল তা হোক তুমি দরজা খোল, সুন্দরী কিছুতেই দরজা খুলিতে সম্মত হয়েন না, চৌকিদার পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করায় দরজা খুলিলেন, এবং গোয়াল ঘরের চালার নিকট দাঁড়াইয়া দুজনে কত কথা কহিতে লাগিলেন, গুণ্ডা এই অবসরে ঘরে গিয়া যুবকের ঘরের আলোটা নিভাইয়া ব্যাগ, হাতের হীরার অঙ্গুরী ও উড়ানি লইয়া আসিয়া উহাদের দুজনকে দরজার কাছে দাঁড়ান দেখিয়া গোলার তলায় ব্যাগ উড়ানী ইত্যাদি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল যুবতী বলিতেছেন আমি ব্রাহ্মণ কুলে কালি দিয়া কি

তাহা কখনই খণ্ডন হইবে না। তুমি আজ রাতটা বাড়ীতে যাও আগামী কল্য স্বামী চলিয়া গেলে, পূর্ব্ববৎ তুমি আসিও, বিজাতি ও বিধর্ম্মীর সহিত অকপট প্রণয়, সে শুনবে কেন? চোরায় না মানে ধর্ম্মের কাহিনী, চৌকিদার বলিল, আমি তোর-স্বামীকে খুন করিব, চম্পক বরণী যুবতী সুন্দরী অমনি যবন চৌকিদারের পদের উপর পড়িলেন, আমাকে রক্ষা কর স্বামীহত্যা আমার সম্মুখে করিও না। ওগো ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্কিনী! তুমি যে সামান্য যবনের নিকট কৃতদাসী হইয়াছ, যবন তোমার কথা শুনিবে কেন? বানরকে লাই দিলে সে কি পদ তলে থাকে? প্রেম যে কত নীচ গামিনী তাহা কি বুঝিতে পার না? কলঙ্কিনী! সামান্য একটা গুণ্ডারও আজ চোক ফুটাইলি! সেও আজ তোকে যবন কলঙ্কিনী ভাবিল।

যবন, স্বামীকে খুন করিবেই, নিকটে একটা ঢেকির মুগার ছিল সেইটা হাতে তুলিয়া যবন যখন ঘরে ঢুকিতে উদ্যত, তখন বিধুবদনী উহার পায়ে ধরিয়া আবার বাধা দিল, এই অবসরে গুণ্ডা বুঝিল যাহাকে আমি মারিতে পারি নাই আমার সাক্ষাতে সেই মহাপুরুষের কুলটা স্ত্রীর যবন উপপতির হাতে মৃত্যু হইবে ইহা কখনই দেখিব না, গুণ্ডা ঘরে গিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিল, যেমন যবন নিদ্রিত যুবকের মাথায় মুগুরের আঘাত করিবে, অমনি হাতের নিকট এক খানি কুঠার ছিল উহা দ্বারা চৌকিদারের মাথা একেবারেই উড়াইয়া দিয়া গুণ্ডা বাহির হইয়া—গোলার তল হইতে ব্যাগ ও উড়ানি লইয়া প্রস্থান করিল, চৌকিদার রক্তের উপর ভাসিতে লাগিল, কুলটা আলো জালিয়া দেখে যে স্বামী নিদ্রিত, অথচ

যবন শক্র মৃত ও রক্তের উপর পড়িয়া খাবি খাইতেছে, অকপট প্রণয় আজ রুধির পান করিতেছে, হাঁগা ব্রাহ্মণ-গৃহ লক্ষ্মী! তুমি আর কি দেখিতেছ? তুমিও ঐ রক্তে ডুব দাও, স্ত্রী জাতি অবধ্যা বলিয়া বোধ হয় গুণ্ডা তোমায় মারে নাই, কলঙ্কিনী এখন কি করিবে? তখন কলঙ্কিনী চীৎকার করিতে লাগিলেন ওগো তোমরা এসগো আমার স্বামী চৌকিদারকে কুঠারাঘাতে খুন করিয়াছে, স্বামী ঐ ভীমার নাদে জাগ্রত হইয়া ভীমায় চীৎকারে কম্পিত হইয়া চুপ করিয়া উহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়ে আসিয়া দেখে স্বামী ফ্যাল ফ্যাল করিতেছেন আর মত্ত মাতঙ্গিনী জোরে চীৎকার করিয়া স্বামীকে খুনের জন্য দায়ী করিতেছেন। গ্রামের শ্রেষ্ঠ লোকেরা পুলিশে সংবাদ দিয়া তখনি যুবককে বন্ধন করিয়া যবন লাসকে লইয়া যুবতিসমভি-ব্যাহারে থানায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে আদিষ্ট হইলেন।

হা হতভাগিনী! তুই আর কি করিতে পারিস? মিথ্যা, প্রতারণা ও ছলনা কি তোদের কুলধর্ম? মায়া, মমতা, দয়া ও অশ্রু এই সকল সদগুণ কি তোদের নিকট স্থান পায় না? না তোদের কুটিল গতির নিকট ইহারা থাকিতে ইচ্ছা করে না? তোরাই না গৃহের লক্ষ্মী? তোরাই না সংসারের সার জিনিষ? তোরাই না পতিব্রতার উদাহরণ স্থল? তোরাই না সন্তানের জননী? তোরাই না অবলা সরলা? তোরাই না সংসারের শুচি ও শুদ্ধাচারিণী ও পুরুষের সান্ত্বনাস্থল? তোরাই না পুরুষের পথবিবর্জ্জিতা, তোরাই না করুণারূপিণী, তোরাই না পুরুষের পরামর্শের মন্ত্রী,

তোরাই না সেবা শুশ্রুষার দাসী, তোরাই না ক্ষমা গুণে পৃথিবী, তোরাই না স্নেহেতে মাতার সদৃশী, তোরাই না রন্ধন কার্য্যে অন্নপূর্ণা, তোরাই না রঙ্গরসে সখী? তোদের বিশ্বাস কে করিতে পারে? তোদের হাসিতেও কপটতা, আর তোদের অশ্রুতেও কপটতা। হাঁগা, মুখুয্যেদের কুলকন্যা তুমি না বাড়ুয্যেদের কুলবধূ! হাঁগা এখন যে পুলিশের ন্যায় বিচারে পড়িলে, বুঝিয়া দেখ তোমার অপকর্ম্মং কিং ভবিষ্যতি। যখন ধর্ম্মাসনে বসিয়া ন্যায় বিচার হইতে থাকিবে তখন কি আর তোমার স্বামীকে খুনের জন্য দোষী করা কথা আদালতে শুনিবে, তুমি সকলেরই চক্ষু দান করিবে। এখনও কৃত অপরাধের জন্য ভগবানকে ডাক, যদি তোমার মত পাপিনী মুক্তি পায়। আহা যবন লম্পট তোমার পরিণাম কি? তোমার কার্য্যের জন্য তোমার কবরেও স্থান হইল না, অকপট প্রণয়ের পরিণাম কি এইরূপ? তোমার মৃত দেহ ক্রমে ক্রমে জেলায় চলিল, তোমার দেহের কত পরীক্ষা হইবে তৎপরে কুকুর শৃগালে ভক্ষণ করিবে। পুলিশ হইতে তদন্ত হইয়া মোকদ্দমা জজের বিচারাধীন হইল, ক্রমে ক্রমে মোকদ্দমার দিন পড়িতে লাগিল। কনকলতার প্রায় মুখুয্যে দুহিতা সাক্ষী দিতে লাগিলেন যে আমার স্বামী কুঠার দ্বারা চৌকিদারকে খুন করিয়াছেন এখনও প্রণয়ের আশা মেটে নাই, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তাহা বিশ্বাস না করিবে কে? কিন্তু গুণ্ডা প্রতিদিন ছদ্মবেশে জজকোর্টের ধারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহার চোক ফুটিয়াছে বাড়ুয্যে বধূ তাহার চক্ষুদান দিয়াছেন, সংসার তাহার পক্ষে বিষবৎ

হইয়াছে, স্ত্রী জাতি তাহার নিকট কালকূট সর্প অপেক্ষা ক্রুরী হইয়াছে, যে দিন মোকদ্দমার বিচার চূড়ান্ত হইল, স্ত্রীর সাক্ষ্যানুসারে যুবকের ক্ষণকালের মধ্যে ফাঁসির হুকুম হইবে, এমন সময় গুণ্ডা কোর্টে গিয়া হাজির হইয়া আবেদন করিল, হুজুর আমি ঐ বিশ্বাসঘাতক যবন চৌকিদারকে খুন করিয়াছি, আদালতের সমস্ত উকিল, আমলা ও দর্শকবৃন্দেরা এই কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন, গুণ্ডা শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে যুবকেরর বাটী পর্য্যন্ত যাওয়ার সমস্ত ঘটনাগুলি বলিয়া আর অপহৃত ব্যাগ, উড়ানি, অঙ্গুরী ইত্যাদি দেখাইয়া দর্শকবৃন্দগণকে একেবারেই স্তম্ভিত করিল, সকলেই আদ্যোপান্ত শুনিয়া বাড়ুয্যে কুললক্ষ্মীকে খুনের জন্য সম্পূর্ণ দোষিনী সাব্যস্ত করিয়া উহার উপর অনন্তকালের জন্য কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

যুবক আদালত হইতে নামিলেন গুণ্ডা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেই ব্যাগ, হীরার অঙ্গুরী ও উড়ানি ইত্যাদি যুবককে দিয়া পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, যুবক সেই দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গুণ্ডাকে প্রত্যর্পণ করিলেন গুণ্ডা তাহা লইতে একদম রাজি নহে, সে বলিতে লাগিল আপনি চরণপ্রান্তে আমাকে স্থান দিন, আমি আর বাটী যাইব না, সেই দিন হইতে পত্নী ত্যাগ করিয়া পথে পথে বেড়াইয়া আপনকার জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলাম। যুবক গুণ্ডাকে প্রাণের ভাই বলিয়া কাছে স্থান দিলেন, উভয়ে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

Printed by J. N. Dutt,
At the New Indian Press, 3, Duff Street.
Published by Rashbehary Ghose,
22, Ramtanu Basu Lane, Calcutta.